বিশেষ সংখ্যা

সচিত্র বাংলাদেশ

জানুয়ারি ২০২২ ■ পৌষ-মাঘ ১৪২৮

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

অগ্রগতির আরও একটি বছর

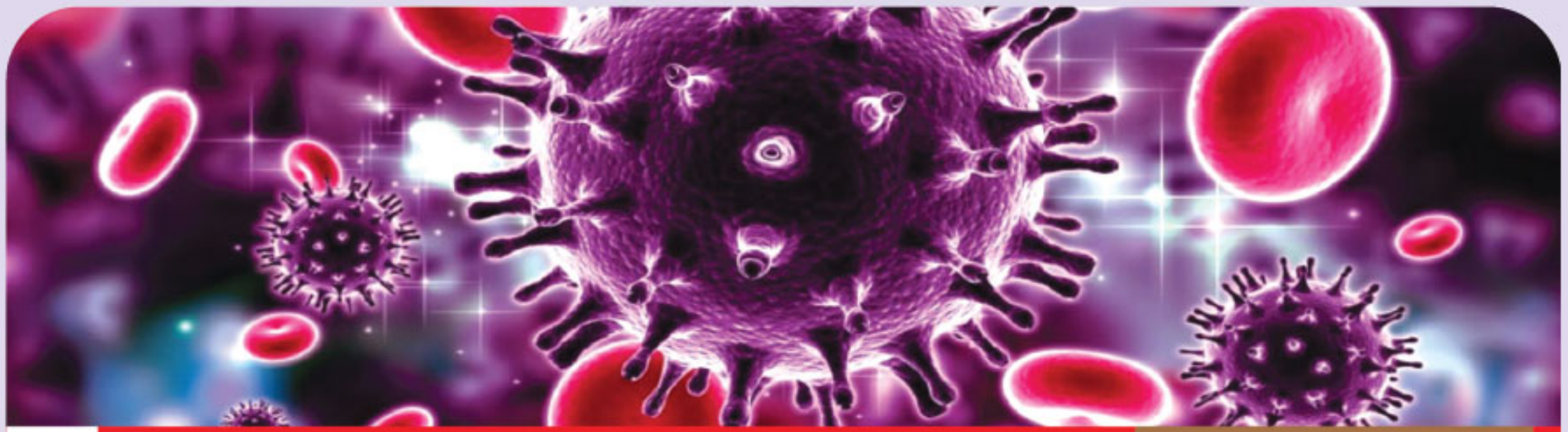

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জানুয়ারি ২০২২ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪২৮

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন –পিআইডি

সম্পাদকীয়

১০ই জানুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনের অন্যতম একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধুকে পেয়ে বাঙালি জাতি বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে। বাঙালি জাতি নানা আয়োজনে পালন করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। তাঁর এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৫০ বছর পূর্তি হলো ১০ই জানুয়ারি ২০২২ সালে। এই দিবসকে উপলক্ষ করে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় এসেছে। ৭ই জানুয়ারি ২০২২ সরকারের বর্তমান মেয়াদের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি সরকারের সফলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'পরপর তিনবার রাষ্ট্রপরিচালনার সুযোগ দিয়ে আপনারা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছেন। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আমরা একটি কল্যাণকামী, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি, যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর কাতারে শামিল হতে পারে।' প্রধানমন্ত্রীর ভাষণটি হুবহু *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এ সংখ্যায় তুলে ধরা হলো। এছাড়া এ সংখ্যায় রয়েছে সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময়োপযোগী নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিষয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন।

এছাড়া গল্প, কবিতা, প্রতিবেদন ও অন্যান্য নিয়মিত আয়োজন নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* জানুয়ারি ২০২২ সংখ্যা। করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে চলেছে। সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব, সতর্ক থাকব আশা করি। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/বিশেষ সংবাদ প্রতিবেদন

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

২০২১ ছিল ঘুরে দাঁড়াবার বছর ৯
প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

বাংলা ও বাঙালির সমন্বিত প্রতিকৃতি বঙ্গবন্ধু ১১
প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

বিষণ্ন বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরা ১৫
প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ২৫
মো. রফিকুজ্জামান

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ২৯
প্রফেসর ড. মো. এমরান জাহান

দশই জানুয়ারি: জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ৩৩
খালেক বিন জয়েনউদদীন

ডিএফপিতে 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' বিষয়ে সেমিনার ৩৬
ডায়ানা ইসলাম সিমা

মহাকাব্যের অমর কবির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ৪০
শাফিকুর রাহী

অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ ৪৩
এম এ খালেক

বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরা ৪৮
কাজী সালমা সুলতানা

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার দিন ৫০
বোরহান মাসুদ

তথ্য অধিকার আইন সুশাসনের অঙ্গীকার ৫১
জিনাত আরা আহমেদ

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার ১০০ বছর ৫২
অনুপম হায়াৎ

কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ৫৪
সুস্মিতা চৌধুরী

গল্প

সেদিন দশই জানুয়ারি ৫৬
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ ৬০-৬৩

ম. মীজানুর রহমান, ঈমাম হোসাইন, আনসার আনন্দ, মো. রুহুল আমিন, আবুল হোসেন আজাদ, ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান, বদরুল হায়দার, আবু জাফর আবদুল্লাহ, শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী, রোকসানা গুলশান, সনজিত দে

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬৪

প্রধানমন্ত্রী ৬৫

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৬৬

আন্তর্জাতিক ৬৭

উন্নয়ন ৬৮

ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৮

শিল্প-বাণিজ্য ৬৯

শিক্ষা ৬৯

বিনিয়োগ ৭০

নারী ৭০

সামাজিক নিরাপত্তা ৭১

কৃষি ৭১

পরিবেশ ও জলবায়ু ৭২

বিদ্যুৎ ৭৩

নিরাপদ সড়ক ৭৩

স্বাস্থ্যকথা ৭৪

যোগাযোগ ৭৫

কর্মসংস্থান ৭৫

সংস্কৃতি ৭৬

চলচ্চিত্র ৭৬

মাদক প্রতিরোধ ৭৭

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৭

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৮

প্রতিবন্ধী ৭৮

ক্রীড়া ৭৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি: জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের চিরপ্রস্থান ৮০

হাইলাইটস

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের তিন বছর পূর্তি ৭ই জানুয়ারি। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি সরকার গঠন করে দলটি। সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওমিক্রন নিয়ে এখনই সাবধান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়ক বেয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। এটা অনেকের সহ্য হবে না বা হচ্ছে না। ... জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। বিদেশে উন্নয়ন সহযোগীদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা চলছে।' তিনি আরও বলেন, '২০২২ হবে অবকাঠামো উন্নয়নের মাইলফলক'। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি দেখুন, পৃষ্ঠা-**৪**

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

মহান মুক্তিযুদ্ধে অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসাধারণ যুদ্ধে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বিজয়ের স্বাদ ও আনন্দের মধ্যেও উৎকণ্ঠা, শূন্যতা ও অপূর্ণতা ছিল। পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি মুক্তি দেয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে বীরের বেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিনই বাংলাদেশের বিজয়ের স্বাদ পরিপূর্ণতা পায়। 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু'– স্লোগানে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়। এদিনে তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি চলে যান রেসকোর্স ময়দানে। সেখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ জনসমুদ্রের মাঝে ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে 'বাংলা ও বাঙালির সমন্বিত প্রতিকৃতি বঙ্গবন্ধু', 'বিষণ্ন বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরা', 'বঙ্গবন্ধুর

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা', 'দশই জানুয়ারি: জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস', 'মহাকাব্যের অমর কবির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন', 'বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরা' ও 'স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার দিন' শীর্ষক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা-**১১, ১৫, ২৯, ৩৩, ৪০, ৪৮, ৫০**

অগ্রগতির আরও একটি বছর

পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের পথে। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল, ঢাকার মেট্রোরেলসহ বড়ো বড়ো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতীয় আয়, প্রবৃদ্ধি, গড় আয়ু, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ পায় বাংলাদেশ। অর্থনীতির সব খাতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অগ্রগতির আরও এক বছর নিয়ে দেখুন '২০২১ ছিল ঘুরে দাঁড়াবার বছর' শীর্ষক প্রবন্ধ পৃষ্ঠা-**৯** এবং 'অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ' শীর্ষক নিবন্ধ পৃষ্ঠা-**৪৩**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই জানুয়ারি ২০২২ বর্তমান সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

ঢাকা, ৭ই জানুয়ারি ২০২২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের খ্রিষ্টীয় নতুন বছর ২০২২-এর শুভেচ্ছা।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিনভাই– মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপটেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ জামাল এবং ১০ বছরের শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, মুক্তিযোদ্ধা যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, মুক্তিযোদ্ধা কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ব্রিগেডিয়ার জামিল এবং পুলিশের এএসআই সিদ্দিকুর রহমানসহ সেই রাতের সকল শহিদকে।

এ উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

স্মরণ করছি ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহত আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমানসহ ২২ নেতাকর্মীকে। স্মরণ করছি ২০০১ সালের পর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ.এম.এস. কিবরিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টার, মঞ্জুরুল ইমাম, মমতাজ উদ্দিনসহ ২১ হাজার নেতাকর্মীকে।

২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামাত জোটের অগ্নি সন্ত্রাস এবং পেট্রোল বোমা হামলায় যারা নিহত হয়েছেন আমি তাদের স্মরণ করছি। আহত ও স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর যেসব রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মারা গেছেন, আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ানসহ সম্মুখসারির যেসব যোদ্ধা মারা গেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে আমাদের বিগত ২০২০ এবং ২০২১ সাল অতিক্রম করতে হয়েছে। সেই সংকট এখনও কাটেনি। এর মধ্যেই আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন করে করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের এখনই সাবধান হতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। যারা টিকা নেননি তাদের দ্রুত টিকা নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

এখন পূর্ণোদ্যমে কোভিড-১৯ টিকাকরণের কাজ চলছে। চলতি মাস থেকে গণটিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতি মাসে ১ কোটি মানুষকে টিকার আওতায় আনার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১২ কোটি ৯৫ লাখ ৮০ হাজার ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ডোজ পেয়েছেন প্রায় ৭ কোটি ৫৮ লাখ মানুষ আর দুই ডোজ পেয়েছেন ৫ কোটি ৩৫ লাখ ৮২ হাজার। গত মাস থেকে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে। বর্তমানে আমাদের হাতে সাড়ে ৯ কোটিরও বেশি ডোজ টিকা মজুত আছে।

করোনাভাইরাস মহামারি বিশ্ব অর্থনীতিতে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। অনেক দেশের অর্থনীতিতে ধস নেমেছে। আমাদের অর্থনীতিও ক্ষতির মুখে পড়েছে। নেমে এসেছিল স্থবিরতা।

তবে আপনাদের সহায়তায় আমরা তা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। বিভিন্ন নীতি-সহায়তা এবং বিভিন্ন উদারনৈতিক আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানের মাধ্যমে আমরা অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখন পর্যন্ত আমরা ২৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। এর মধ্যে অক্টোবর পর্যন্ত ১ লাখ ৬ হাজার ৫২২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৫৬.৭৬ শতাংশ। এতে প্রায় ৬ কোটি ৭৪ লাখ মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার।

করোনাভাইরাসের অভিঘাত মোকাবিলা করে গত অর্থবছরে আমাদের জিডিপি ৫.৪৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রক্ষেপণ অনুযায়ী জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২১-এ মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৫৪ মার্কিন ডলারে।

দ্য ইকোনমিস্ট ২০২০ সালের প্রতিবেদনে বলেছে, ৬৬টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯ম। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি। একইসঙ্গে উদ্‌যাপন করেছি মুজিববর্ষ।

করোনাভাইরাসের কারণে এই উদ্‌যাপন কিছুটা সীমিত হলেও মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনো কমতি ছিল না। দেশবাসী মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নতুন করে দেশ গড়ার শপথ নিয়েছেন।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের। যেখানে সকল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশার মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। প্রতিটি মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার সুযোগ পাবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাঁকে সপরিবার হত্যা করে। তাঁকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

তারপর অনেক চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র। সামরিক শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষণ, গণতন্ত্রহীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিচ্যুতি, ইতিহাস বিকৃতিসহ শাসকদের নানা অপকীর্তি প্রত্যক্ষ করেছে এ দেশের মানুষ। জনগণের সম্পদ লুটপাট করে, তাদের বঞ্চিত রেখে, ৩০ লাখ শহিদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করে বাংলাদেশকে পরনির্ভরশীল করে রেখেছিল।

১৯৭৫ সালের বিয়োগান্তক ঘটনার পর ৬ বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে আমি ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি। আমার একটাই লক্ষ্য ছিল জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানো।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। মাঝখানে ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিএনপি-জামাত এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সে প্রচেষ্টায় ছেদ পড়েছিল।

কিন্তু ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ১৩ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর্থসামাজিক এবং অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশ বিস্ময়কর উন্নয়নসাধন করেছে। ২০২১ সাল ছিল আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রার এক অভূতপূর্ব স্বীকৃতির বছর। গত বছর আমরা উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিববর্ষে এই অর্জন বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা ২০১৮ সালে একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক ইশতাহার ঘোষণা করেছিলাম। আমাদের নির্বাচনি ইশতাহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল– দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নির্মূল করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতা মুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা।

২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের সমৃদ্ধশালী দেশ।

গত বছর ২০২১-২০২৫ মেয়াদি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে, যা বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। এ মেয়াদে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে নেমে আসবে। শেষ বছর ২০২৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

দাঁড়াবে ৮.৫১ শতাংশে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে। রূপকল্প–২০৪১-এর কৌশলগত দলিল হিসেবে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

২০২২ সাল হবে বাংলাদেশের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের এক মাইলফলক বছর। আর কয়েক মাস পর জুন মাসেই আমরা উদ্‌বোধন করতে যাচ্ছি বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু। অনেক ষড়যন্ত্রের জাল আর প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শেষ করতে যাচ্ছি। এই সেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে সরাসরি রাজধানীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করবে। আশা করা হচ্ছে, এই সেতু জিডিপিতে ১.২ শতাংশ হারে অবদান রাখবে।

এ বছরের শেষ নাগাদ আমরা উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার অংশে মেট্রোরেল চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ অংশে ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, মেট্রোরেল রাজধানী ঢাকার পরিবহণ খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আগামী অক্টোবর মাসে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে চালু হবে দেশের প্রথম টানেল।

অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্পগুলোর কাজও পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে। এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিট আগামী বছরের এপ্রিল নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী,

জনগণের সরকার হিসেবে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলেই আমি মনে করি। গত ১৩ বছরে আমরা আপনাদের জন্য কী কী করেছি, তা আপনারাই মূল্যায়ন করবেন। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, আমরা যেসব ওয়াদা দিয়েছিলাম, আমরা তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি।

আমি কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

বিদ্যুৎ বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। ২০০৯ সালে আমাদের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির কথা আপনাদের মনে আছে। তখন সাকুল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ছিল ৪,২০০ মেগাওয়াট। বর্তমানে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াটে। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমরা সে প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেছি। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পায়রাতে ইতোমধ্যে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। রামপাল, পায়রা, বাঁশখালী, মহেশখালী এবং মাতারবাড়িতে আরও মোট ৭ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

২০০৯ সালে জাতীয় গ্রিডে ১ হাজার ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হতো, বর্তমানে যা ২ হাজার ৫২৫ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। গ্যাসের অব্যাহত চাহিদা মেটাতে ২০১৮ থেকে তরলীকৃত গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে। নববর্ষের শুরুতে আমাদের জন্য সুখবর হচ্ছে, বঙ্গোপসাগরে যে গ্যাস হাইড্রেটের সন্ধান পাওয়া গেছে তার পরিমাণ ১৭ থেকে ১০৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

প্রিয় দেশবাসী,

আজ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লাখ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান, সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে ৩য় স্থানে উন্নীত হয়েছে। অব্যাহত নীতি, সহায়তা ও প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে এই বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মাছ, মাংস, ডিম, শাকসবজি উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

প্রিয় দেশবাসী,

অতীতের সরকারগুলোর আমলে আমাদের গ্রামগুলো বরাবরই উন্নয়ন ভাবনার বাইরে ছিল। আমরাই প্রথম গ্রামোন্নয়নকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করি। ২০১৮ সালে আমাদের নির্বাচনি ইশতাহারে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে 'আমার গ্রাম, আমার শহর'– এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করি।

আজ দেশের প্রায় সকল গ্রামে পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পল্লি এলাকায় ৬৬ হাজার ৭৫৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ৩ লাখ ৯৪ হাজার ব্রিজ-কালভার্ট, ১ হাজার ৭৬৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ১ হাজার ২৫টি সাইক্লোন সেন্টার এবং ৩২৬টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

২০০৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৪৫৮ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চার বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। আরও ৮৮৭ কিলোমিটার মহাসড়ক চার এবং তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। ঢাকায় বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ ২০২৩ সাল নাগাদ শেষ হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে যুগোপযোগী এবং আধুনিক গণপরিবহণ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে ১৩ হাজার ৩৭১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩৭টি প্রকল্পের কাজ চলছে। ঢাকার চারদিকে সার্কুলার রেললাইন স্থাপনের সমীক্ষার কাজ চলছে। ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ৪৫১ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং ১ হাজার ১৮১ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৪২৮টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ করা হয়েছে। যমুনা নদীর উপর ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের বিমান বহরে ১২টি নতুন অত্যাধুনিক বোয়িং এবং ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ সংযোজিত হয়েছে। সংযোজিত হয়েছে ৩টি ড্যাশ-৮-৪০০ উড়োজাহাজ।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ঘাতপ্রতিঘাত মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এর আগে আমরা 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা–২১০০' শীর্ষক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এই পরিকল্পনার আওতায় ৬৪টি জেলায় প্রায় ৪ হাজার ৪৩৯ কিলোমিটার নদী, খাল ও জলাশয় খনন করা হচ্ছে।

সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সারা দেশে সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে গ্রামীণ নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়। আমাদের স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানোন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ২০১৯-২০২০ বছরে ৭২.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। ৫ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৮ ও অনূর্ধ্ব ১ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর হার ১৫-তে হ্রাস পেয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি লাখে ১৬৫ জনে।

প্রিয় দেশবাসী,

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তবে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। অনলাইনে এবং স্কুল পর্যায়ের জন্য টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। মহামারির প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় ইতোমধ্যে পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই বিতরণ শুরু হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৯৫৮ কোটি টাকার বৃত্তি-উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় স্নাতক ও সমমানের শ্রেণির আরও ২ লাখ ১০ হাজার ৪৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১১১ কোটি বিতরণ করা হয়।

দেশের ৭ হাজার ৬২৪টি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৬১ জন শিক্ষক কর্মচারীকে প্রতিমাসে ২৭৬ কোটি টাকা বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ২০২০ সালে নতুন করে ৪৯৯টি মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ১ হাজার ৫১৯টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৪ হাজার ৫২৯ জন শিক্ষককে ত্রৈমাসিক ৩ কোটি ১৫ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। দাওয়ারে হাদিস পর্যায়কে মাস্টার্স সমমান দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

আমাদের সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই এই ক্রান্তিকালে ডিজিটাল প্রযুক্তি ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেশের ১৮ হাজার ৪৩৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের নবম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গত মাসে ৫জি নেটওয়ার্কের যুগে প্রবেশ করেছে।

করোনাভাইরাসের সময় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। অনলাইনে ব্যাবসাবাণিজ্য এবং লেনদেন সুবিধা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের প্রায় ৬ লাখ তরুণ-তরুণী আজ ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। আমরা এ খাতের উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছি।

আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১-এর মাধ্যমে দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছাড়াও প্রত্যন্ত ৩১টি দ্বীপে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি ব্যাংক এবং সেনাবাহিনী স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১-এর সেবা গ্রহণ করছে।

ইন্টারনেট বিপ্লবের পর বিশ্ব এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে, তেমনি খুলে দিবে সম্ভাবনার দ্বার। আমাদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের রয়েছে বিপুল সংখ্যক তরুণ। এই তরুণ প্রজন্মকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তোলার যাবতীয় উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করছি।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, চা শ্রমিক, বেদে সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীসহ দুরারোগ্য ব্যক্তিদের চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে সর্বমোট ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২ লাখ ৮৭ হাজার। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ১২ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৯৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতক খাস জমি বরাদ্দ দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। কক্সবাজারের খুরুশকুলে ১৩৯টি ৫তলা ভবনে ৪ হাজার ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব ফ্ল্যাট উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ইতোমধ্যে ১৯টি ভবন বরাদ্দকারীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ঢাকায় বস্তিবাসীদের জন্য মিরপুরে ১০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে গত বছরের মাঝামাঝি ৩০০ পরিবারের মধ্যে ফ্ল্যাট বিতরণ করা হয়েছে।

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা নারী সমাজকে উৎপাদন এবং সেবামূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছি। নারীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'– জাতির পিতা প্রণীত বৈদেশিক নীতির এই মূলমন্ত্রকে পাথেয় করে আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে এই মুহূর্তে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।

মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কক্সবাজারে বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য ভাসানচরে ১ লাখ মানুষের বসবাসোপযোগী উন্নতমানের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়ক বেয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা অনেকেরই সহ্য হবে না বা হচ্ছে না। দেশ-বিদেশে

বসে বাংলাদেশবিরোধী শক্তি, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাই নানা ষড়যন্ত্র করছে এই অগ্রযাত্রাকে রুখে দেওয়ার জন্য। মিথ্যা-বানোয়াট-কাল্পনিক তথ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। বিদেশে আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু কেউ যাতে মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে, সেদিকে আমাদের সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে কোনোভাবেই ব্যাহত হতে দেওয়া যাবে না। জনগণই ক্ষমতার উৎস। আমরা জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস করি। তাই জনগণের সঙ্গেই আমাদের অবস্থান।

আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছি। দুর্নীতিবাজ যে দলেরই হোক আর যত শক্তিশালীই হোক, তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং হবে না। এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। তবে এই ব্যাধি দূর করতে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।

আমরা কঠোর হস্তে জঙ্গিবাদের উত্থানকে প্রতিহত করেছি। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ পারস্পরিক সহনশীলতা বজায় রেখে বসবাস করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

বিগত ১৩ বছরে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, মাতৃমৃত্যু-শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ নানা আর্থসামাজিক সূচকে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের উপর আস্থা রাখার ফলে। পর পর তিনবার রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দিয়ে আপনারা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছেন। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আমরা একটি কল্যাণকামী, উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর কাতারে শামিল হতে পারে। এজন্য অতীতে যেমন আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন– এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমাদের বর্তমান এবং আগামী দিনের সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ। অফুরন্ত জীবনীশক্তিতে বলীয়ান তরুণ প্রজন্মই পারে সকল কূপমণ্ডুকতা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন। তারুণ্যের শক্তিই পারবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এগিয়ে যাবে মাথা উঁচু করে ভবিষ্যতের পানে।

করোনাভাইরাসের নতুন ঢেউ থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে রক্ষা করুন– এই প্রার্থনা করি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বিএসএফআইসিতে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'

রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) প্রাঙ্গণে ২৮শে ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্‌বোধন করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্‌বোধনের পর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমরা চিনিকলগুলোকে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের পরিকল্পনা নিয়েছি। চিনিকলগুলো লাভজনক করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উচ্চফলনশীল আখ উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কলকারখানাগুলো আধুনিকায়নের কাজ চলছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শীঘ্র চিনি শিল্পের সুদিন ফিরে আসবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান মো. আরিফুর রহমান অপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসএফআইসির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও অবিসংবাদিত নেতা। তিনি রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে ৭ই মার্চ যেমন স্বাধীনতার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি ১০ই জানুয়ারি দিয়েছিলেন দেশ গড়ার নির্দেশনা। তিনি আরও বলেন, বিএসএফআইসিতে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, জীবনাচার, রাজনৈতিক দর্শন, নেতৃত্বগুণ, দেশপ্রেমসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ পাবে। শিল্পমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের আলোকে *আলোর বাতিঘর বঙ্গবন্ধু* শিরোনামে স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রতিবেদন: ইভা আক্তার

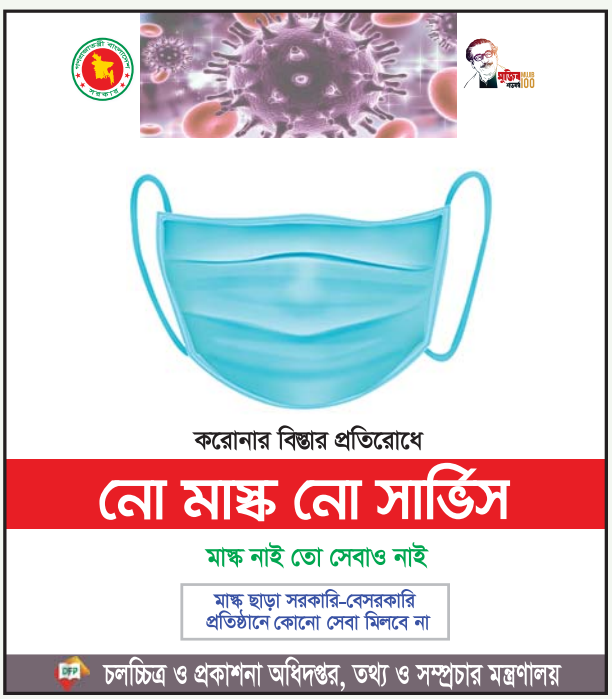

২০২১ ছিল ঘুরে দাঁড়াবার বছর

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

করোনার সংকট সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি তার শক্তিমত্তা দেখিয়ে চলেছে। যে শক্তি পাটাতন গড়ে দিয়েছে আমাদের কৃষি, প্রবাসী আয় ও রপ্তানির। তার ওপর ভিত্তি করেই এগিয়ে চলেছে গতিময় এক বাংলাদেশ।

২০২১ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলা চলে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে জানা যায় যে, গেল নভেম্বর মাসে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের হার ১০.১১ শতাংশ বেড়েছে। অক্টোবরে তা ছিল ৯.৪৪ শতাংশ। ডিসেম্বরে হয়ত এই হার এগারো শতাংশের আশপাশেই চলে গেছে। যদিও মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার (১৪.৮%) থেকে এই হার প্রায় চার শতাংশ কম তবুও গত দুবছরের মধ্যে তা সর্বোচ্চ। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে তা ছিল ১০.৭ শতাংশ। গত অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসের তুলনায় এই অর্থবছরের একই সময়ে আমদানি খরচ ৫৪ শতাংশ বেড়েছে। মূলধন যন্ত্রপাতির আমদানি বেড়েছে ৩০ শতাংশ। সুতার আমদানি বেড়েছে ১০৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুমাসে রপ্তানি বেড়েছে ২৮ শতাংশ। প্রধান বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং বেড়েছে ১৬ শতাংশ। ২০২১ সালে প্রবাসী আয় হয়েছে ২২ বিলিয়ন ডলার। এসব কিছুই ইঙ্গিত করছে যে, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বেশ জোরেসোরেই ঘটছে। পাশাপাশি দেশের ভেতরেও মানুষের ভোগ বেড়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ চাহিদাও বেড়েছে।

হঠাৎ করে অর্থনীতির দুয়ার খুলে গেছে বলে আমদানির চাহিদা এতটা বেড়েছে। অন্যদিকে কোভিড মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি ও সরকারের সামাজিক সুরক্ষা ও ভরতুকি নীতির কারণে এখনও বাজারে প্রচুর টাকা ঘোরাফেরা করছে। সেজন্যে মূল্যস্ফীতি খানিকটা বাড়ন্ত। ব্যাংক রেট, সিআরআর, এসএসআরসহ বিভিন্ন নীতি হার কমিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারকে আরও তরল করেছে। সুদে ভরতুকি দেওয়ার বেলায় সরকার খুবই উদার ছিল এবং এখনও আছে। ফলে বাজারে তারল্য প্রচুর। বড়ো উদ্যোক্তারা এর পূর্ণ সুযোগ নিলেও ক্ষুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তা নিয়মনীতির জটিলতার কারণে এই তারল্যের সুযোগ সেভাবে নিতে পারছে না। তবে হালে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নজর এদের দিকে বাড়িয়েছে। ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করেছে। ব্যাংকগুলোকেও ছোটো ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বেশি বেশি অর্থ জোগানের জন্য চাপ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকারদের ধারণা, নতুন বছরে ব্যাবসাবাণিজ্যের গতি বাড়বে। তবে কোভিড-১৯-এর তৃতীয় ঢেউ এই আশাবাদকে খানিকটা ব্যাহত করতে পারে। বিশেষ করে রপ্তানি চাহিদা কমে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। তবে টিকা কর্মসূচি সারা বিশ্বেই জোরদার করা হচ্ছে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। এ কারণে হয়ত ব্যবসায়ীদের আস্থা অটুট থাকবে। টিকা দেওয়ার হার বাড়িয়ে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সংস্কৃতিকে আরও জোরদার করে আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। 'লকডাউনের' মতো ব্যাবসাবাণিজ্য সংকোচনধর্মী পথকে এড়িয়ে চলাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া যে বেশ শক্তিশালী তার প্রমাণ মেলে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম দুই মাসের শিল্প উৎপাদনের হার দেখে। এই সময়ে শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে ৭.৩৩ শতাংশ। মূলত বড়ো ও মাঝারি শিল্প ইউনিটে এই প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। তবে ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের গতি এখনও বেশ মন্থর। আর সে কারণেই আগামী বছরে বাংলাদেশ ব্যাংককে এ খাতে অর্থ প্রবাহের নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। একটি উপায় হচ্ছে ব্যাংকগুলোকে আগের মতোই সুদে ভরতুকি দিয়ে ক্ষুদ্র খাতে অর্থ প্রবাহে উৎসাহিত করা। পিকেএসএফ ও

এসএমই ফাউন্ডেশনকে বাড়তি অর্থ দিয়ে এ খাতের ক্লাস্টারে ক্লাস্টারে ঋণের প্রবাহ বাড়ানো যেতে পারে। একইসঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে কম সুদে ঋণের সরবরাহ বাড়িয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের কাছে বাড়তি ঋণ দেওয়া যেতে পারে। অংশগ্রহণমূলক এমন ব্যবস্থা এদেশে অনেকদিন ধরেই চালু রয়েছে। এখন এই ধারাকে আরও জোরদার করা উচিত। গ্রামেগঞ্জে ক্ষুদ্র ঋণের চাহিদা রয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি তাই এমএফআইগুলোকে বেশি করে ব্যাংক থেকে 'হোলসেল' ঋণ পেতে সহযোগিতা করতে পারে। পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠান আরও বেশি করে সঞ্চয় সংগ্রহ করার সুযোগ পেতে পারে। এখন এমএফআইগুলো একটা সীমিত পরিমাণে সঞ্চয় সংগ্রহ করে থাকে। এই বিধিনিষেধ শিথিল করলে প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বেশি বেশি ঋণ দিতে পারবে।

২০২০ সালে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন হারে টাকা বেশ চাপের মধ্যে ছিল। রিজার্ভও দ্রুত বাড়ছিল না। মূলত আমদানির হার বেশি এবং প্রবাসী আয় বৃদ্ধির হার কম হবার কারণে এই চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবাসী আয় হালে বাড়তে শুরু করেছে। মালয়েশিয়াসহ বিদেশে শ্রমিক নিয়োগের হার বাড়তে শুরু করেছে। এখন যদি সরকার প্রবাসী আয়ের ওপর নগদ প্রণোদনা আরেকটু বাড়ায় (আধা থেকে এক শতাংশ) তাহলে ২০২২ সালে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়বে। একইসঙ্গে ডলার বন্ডগুলোর ঊর্ধ্বসীমা এক কোটি টাকা পর্যন্ত আগের সুদ হারে রেখে, এর বেশি পরিমাণের ওপর সুদ কমিয়ে ঊর্ধ্বসীমা উন্মুক্ত করে দিলে অনেক বিদেশি মুদ্রা দেশে প্রবেশ করবে। এমন উদ্ভাবনীমূলক নীতি সমর্থন দেওয়া গেলেই বিদেশি মুদ্রার প্রবাহ বাড়বে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে কম সুদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণে আরও 'স্মার্ট নেগোসিয়েশনে'র কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের দায় জিডিপির অংশ হিসেবে বেশ কম। রিজার্ভ খুবই সন্তোষজনক। তাই দরকষাকষির সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। এখন এর প্রয়োগ চাই। আগের মতো শর্ত দিয়ে ঋণ দেওয়ার কৌশল আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে পরিবর্তন করতে হবে। বাংলাদেশ কখনও বিদেশি ঋণের কিস্তি শোধে গাফিলতি করেনি। তাই তার মতো ঋণগ্রহীতা এসব প্রতিষ্ঠান পাবে কোথায়? সেজন্য আমাদের নিজেদের 'হোমওয়ার্ক' খুব ভালোভাবে করতে হবে। আমাদের ম্যাক্রো অর্থনীতির শক্তিমত্তার উৎসগুলো খুবই মুনশিয়ানার সাথে এসব সংস্থার সামনে তুলে ধরতে হবে। আমার বিশ্বাস, কোভিড ব্যবস্থাপনায় আমাদের সাফল্য, রপ্তানি খাতের গতিময়তা, প্রবাসী আয়ের বাড়ন্ত অবস্থা এবং অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে দরকষাকষির নয়া কৌশল গ্রহণ করাটা এখন সময়ের দাবি।

নিঃসন্দেহে এখন আমাদের অর্থনীতিতে জীবিকার অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। তবে সাময়িক এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পথনকশা আমাদের রচনা করে যেতে হবে। আশা করা যায়, নতুন বছরে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার হবে অর্ধ-ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রবৃদ্ধি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দুই অঙ্কের ঘরে নিয়ে যাওয়ার যে লক্ষ্য করোনা আসার আগেই ঠিক করা হয়েছিল, নতুন বছরে তা অর্জনের পথে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে। এজন্য একদিকে কৃষির সাফল্য অব্যাহত রাখতে হবে, অন্যদিকে শিল্প খাতের বিকাশ সহায়ক পরিবেশ আরও উন্নত করা দরকার হবে। আমাদের কৃষিপণ্য প্রবাহ আন্তর্জাতিক সরবরাহ চেইনের সাথে আরও বেশি মাত্রায় যুক্ত করতে হবে। দেশজ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে এবং সে জায়গাটুকু যেন দেশীয় উৎপাদকরা দখল করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বদেশি শিল্পকে উৎসাহিত ও বিকশিত করতে 'মেইড ইন বাংলাদেশ'-এর যে স্লোগান প্রধানমন্ত্রী সামনে এনেছেন, ২০২২ সালে তা বাস্তবায়নে আমরা আরও অগ্রসর হবো বলেই মনে হচ্ছে। আরএমজিতে সমর্থন অব্যাহত রেখেই অন্যান্য রপ্তানিমুখী খাত বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্যোগগুলোকে ২০২২-এ কার্যকর নীতি, সহায়তা ও অর্থায়ন করা গেলে বড়ো সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের সাফল্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হবে। এতে গার্হস্থ্য ব্যবহারকারী এবং শিল্পোদ্যোক্তা– উভয় শ্রেণিই উপকৃত হবেন। আর সবুজ জ্বালানির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আরও গতি অর্জন করা যাবে ২০২২-এ। নতুন বছরে আমাদের আমদানিতে স্থিতিশীলতা আসবে এবং রপ্তানি আরও চাঙ্গা হবে। এখন পর্যন্ত নেওয়া নীতি উদ্যোগগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গেলে তা খুবই সম্ভব। আর এমনটি হলে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট আবার ধনাত্মক হবে। ফলে ডলারের দাম কমে আসবে। মেগা প্রকল্পগুলোই হবে আমাদের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মূল ক্ষেত্র। করোনার ধকল কাটিয়ে ২০২২ সালে মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন নতুন গতি লাভ করবে বলেই মনে হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ধরে এগুতে পারলে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে এক্ষেত্রে সফল হওয়া খুবই সম্ভব। সর্বোপরি 'মানুষের ওপর বিনিয়োগ'-এর যে ধারা তৈরি হয়েছে তা ধরে রেখে আরও শক্তিশালী করার বছর হবে ২০২২। শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক সুরক্ষার মতো খাতগুলোতে সম্পদ বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সম্পদের উদ্ভাবনী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সার্বিক বিচারে আমার মনে হয়, নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২১ বছরটি ভালোভাবেই শেষ করেছে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যদি বিচার করি তাহলে বলতে হয়, গত বছরটিতে আমাদের সাফল্যের পাল্লাটিই বেশি ভারি। চ্যালেঞ্জ তো ছিলই। সেগুলো মোকাবিলাও করা হয়েছে দক্ষতার সাথে। ২০২১ জুড়ে মহামারি-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে আমরা যে সাফল্য দেখিয়েছি তার পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে গত ১০-১২ বছরে গড়ে ওঠা শক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং কল্যাণমুখী নেতৃত্বের দূরদর্শী ভাবনা ও সিদ্ধান্তগুলো। সেই ভরসার জায়গা থেকেই ২০২২ নিয়ে আরও বড়ো স্বপ্ন দেখতে পারছি। নতুন বছরে আমাদের এই পুনরুদ্ধারের অভিযান আরও গতিময় হোক– সেই কামনাই করছি।

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

দুর্নীতিকে না বলুন

মুজিববর্ষের চেতনা
দুর্নীতি করবো না

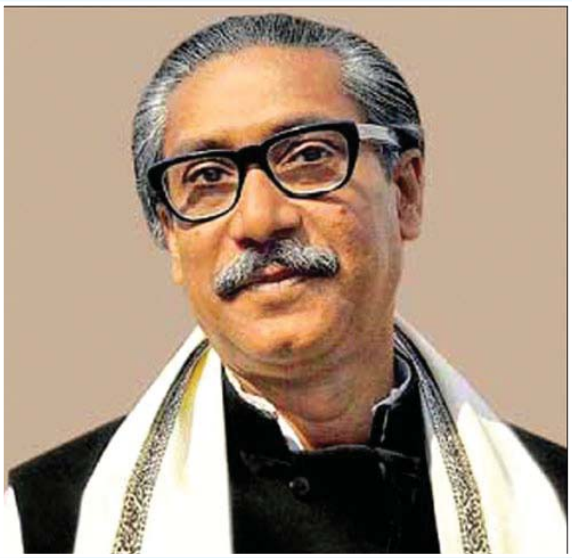

বাংলা ও বাঙালির সমন্বিত প্রতিকৃতি বঙ্গবন্ধু

প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

হাদিসে আছে, 'হুব্বল ওয়াতানু মিনাল ঈমান'– দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। সংস্কৃত প্রবচন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'– জননী আর জন্মভূমি স্বর্গতুল্য গরীয়ান। সব ধর্ম আর সংস্কৃতিতে জন্মভূমিকে এভাবেই দেখা হয়েছে। কাজেই দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবেসে জননন্দিত নেতা হতে হয়। দেশ ও জনগণের প্রতি মমত্ববোধ না থাকলে, আত্মস্বার্থে মগ্ন থাকলে, নেতা তো দূরের কথা, সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীও হওয়া যায় না। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'–নিজের ও জগতের কল্যাণের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করতে হয়। সে কারণে বঙ্গবন্ধুর সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব মওলানা ভাসানী রাজনীতিকে সংজ্ঞায়ন করেছেন এভাবে, '...রাজনীতি হইতেছে এমন একটি কর্মপ্রয়াস যাহার লক্ষ্য সমাজ হইতে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটাইয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা; সমাজে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, বাক্‌স্বাধীনতা তথা সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা।'[১] বঙ্গবন্ধু এমন রাজনীতি করেছেন সারা জীবন। এটা বলা সংগত যে, সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির দীক্ষাগুরু; কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মের বাতিঘর ছিলেন মওলানা ভাসানী।[২]

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির পাটাতন ছিল দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ঐকান্তিক ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎকারে ডেভিড ফ্রস্টকে বলেছিলেন (১৮ই জানুয়ারি ১৯৭২), 'আমার প্রথম চিন্তা আমার দেশের জন্য। আমার আত্মীয়স্বজনদের চাইতেও আমার ভালোবাসা আমার দেশের জন্য। আমার যা কিছু দুঃখভোগ, সে তো আমার দেশেরই জন্য।' একই সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু মানুষলগ্ন নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, '...যথার্থ নেতৃত্ব আসে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কেউ আকস্মিকভাবে একদিনে নেতা হতে পারে না। তাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। নেতার আদর্শ থাকতে হবে, নীতি থাকতে হবে। এইসব গুণ যার থাকে, সেই মাত্র নেতা হতে পারে।' নেতৃত্বের এমন সংজ্ঞায়নে বঙ্গবন্ধু নিজেকেই তুলে ধরেছিলেন। বাংলা ও বাঙালিকে ঘিরে দীর্ঘ লালিত স্বপ্নের রূপায়ণে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে আত্মতৃপ্ত বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২-এ রেসকোর্সে ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র'। ডেভিড ফ্রস্ট জানতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনে সবচেয়ে সুখের দিন কোনটি? বঙ্গবন্ধুর উত্তর ছিল, 'আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সব চাইতে সুখের দিন।'[৩] উপরন্তু বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারির ভাষণেই বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।' লক্ষণীয়, একটি ছোটো বাক্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক ও দৈশিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। তবে আত্মপরিচয় সংক্রান্ত মোদ্দা কথাটি বলেছেন শেষ বাক্যে। সে মানুষই তার জন্মের মাটিতে সার্বিক অবস্থান চিহ্নিত করেন, যার সঙ্গে থাকে তার আজন্ম লালিত নিবিড় লগ্নতা। কাজেই বঙ্গবন্ধু শাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ। তাঁর মতো করে আর কেউ তো বাংলা ও বাঙালিকে অন্তরের অন্তস্তলে ধারণ করেনি বা এত ত্যাগ স্বীকার করেনি বাংলা ও বাঙালির জন্য।

বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিলগ্নতা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রকৃতিলগ্ন পরিবেশে শৈশব-কৈশোর কাটানো মানুষ। জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যেন জোড় বেঁধেছিল মধুমতী নামের নদীটি। টুঙ্গিপাড়া আর মধুমতী নদী বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোরের পাটাতন নির্মাণ করে দিয়েছিল। এটা বোধ হয় বলা অত্যুক্তি হবে না যে, শিশু-কিশোর খোকা, পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রকৃতির সন্তান। বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন প্রকৃতিপ্রেম এ মানুষটির সত্তায় অন্তর্লীন ছিল।

পাকিস্তান হবার পরপরই বঙ্গবন্ধু খ্যাতিমান পল্লিগীতি গায়ক আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে নৌকায় আশুগঞ্জ আসছিলেন। আব্বাসউদ্দীন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর মন্তব্য বেশ ঐকান্তিক ছিল, 'বাংলার গ্রামে গ্রামে আব্বাসউদ্দীন সাহেব জনপ্রিয় ছিলেন। জনসাধারণ তাঁর গান শুনবার জন্য পাগল হয়ে যেত। তাঁর গান ছিল বাংলার জনগণের প্রাণের গান। বাংলার মাটির সাথে ছিল তাঁর নাড়ির সম্বন্ধ।'[৪] আব্বাসউদ্দীন যখন নৌকায় গান ধরলেন, তখন বঙ্গবন্ধুর প্রতিক্রিয়া ছিল–

> নদীতে বসে আব্বাসউদ্দীনের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। ... আমি আব্বাসউদ্দীন সাহেবের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।' আমি কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।[৫]

মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনার নিরিখে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু নিজে বাংলার নদীলগ্ন ভাটিয়ালি গানের অনুরক্ত ছিলেন বলেই ঢেউয়ের গান

শোনার কথা বলেছিলেন। আব্বাসউদ্দীন ও বঙ্গবন্ধু দুজনেই তো প্রকৃতিপ্রেমে আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিলেন। আব্বাসউদ্দীনের গান আর বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির পাটাতন ছিল বাংলার প্রকৃতি আর প্রকৃতিলগ্ন মানুষ।

১৯৭৩-এ এক ছুটির দিনে পড়ন্ত বিকেলে ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া থেকে আসা পরিচিতজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি যখন মারা যাব, তখন তোরা আমাকে টুঙ্গিপাড়ায় কবর দিবি। কবরে শুয়ে আমি পাখির ডাক শুনব, ধানের সোঁদা গন্ধ পাব। আর আমার কবরে একটি টিনের চোঙা লাগিয়ে দিবি।' সবার অভিন্ন উত্তর ছিল, 'আপনি টুঙ্গিপাড়ার মানুষ, আমরা চাই আপনি টুঙ্গিপাড়ায় থাকবেন।' কিন্তু তাদের জ্ঞাতব্য ছিল, 'মুসলমানের কবরে তো চোঙা লাগানো যায় না।' বঙ্গবন্ধু হেসে বললেন, 'চোঙা লাগাতে চাই এজন্য যে, বাঙালি মনে রাখবে, এ চোঙা ফুঁকে শেখ মুজিব নামে একজন বাঙালি বাঙালি বলে রাজনীতি শুরু করেছিল।'[৬] ঘটনাক্রমে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর অন্তিম শয়ান; তিনি নিশ্চয়ই ধানের সোঁদা গন্ধ পাচ্ছেন, আর পাখির ডাক শুনছেন। কিন্তু বোধগম্য কারণে কবরে টিনের চোঙা লাগেনি। বিশ্রম্ভালাপে উচ্চারিত সাধারণ কথকতায় বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রকৃতিপ্রেম আর তাঁর রাজনীতির মূলসূত্র বাঙালিপ্রেম তুলে ধরেছিলেন। এমন অনানুষ্ঠানিক মন্তব্যেও উচ্চকিত ছিল মানুষটির জীবনসত্য আর অন্তর্লীন বিশ্বাস।

১৯৭২-১৯৭৩-এর কোনো এক সময়ে সিদ্ধান্ত হলো, বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নারকেল গাছের চারা রোপণ করবেন। একজন আমলা সবিনয় প্রশ্ন তুললেন, 'খোলা জায়গায় নারকেল গাছ লাগালে মানুষজন নারকেল খেয়ে ফেলবে।' বঙ্গবন্ধুর উত্তরটি ছিল দিক নির্দেশক, 'দেশ তো ওদেরই। ওরা যদি খায়, তোমার আমার করার কী আছে।'[৭] প্রকৃতি আর আমজনতা প্রেমলগ্ন হয়ে আছে এমন মন্তব্যে।

বাঙালির সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতিকৃতি বঙ্গবন্ধু

ইতিহাসের ধারায় লড়াকু বাঙালির লড়াকু নেতা বঙ্গবন্ধু।[৮] বাঙালি ভেতো-ভীতু এমন বদনামের উৎস ইংরেজ-পাকিস্তানি শাসক-শোষকের উদ্দেশ্যপ্রসূত মানসিক বৈকল্য। বাংলার নরম মাটি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাথরের মতো শক্ত হয়। স্বভাবত নরম বাঙালি প্রয়োজনে শক্ত হয়ে দ্রোহে জ্বলে ওঠে–একথা তো বঙ্গবন্ধুর উচ্চারণেই আছে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে তাই তরুণ প্রজন্মের দ্রোহী কণ্ঠে সোচ্চার উচ্চারণ ছিল– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' বীর বাঙালি অস্ত্র ধরেই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল বীর নেতা বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর দিক নির্দেশনায়।

বঙ্গবন্ধু বাঙালিকেন্দ্রিক রাজনীতি করেছেন লড়াকু বাঙালির ইতিহাস পড়ে। কিন্তু তাঁর মর্মযাতনা ছিল রচিত ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা নিয়ে, যা তাঁর জবানিতে শোনা যাক, 'আজও বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্য দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এই ইতিহাস পাঠ করে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।' (১৯৭১-এর ৪ঠা জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ভাষণ) বঙ্গবন্ধুর বিবেচনায় প্রণীত বাঙালির ইতিহাসের ঘাটতি দুটো লড়াইয়ের গৌরব অনুপস্থিত এবং ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে সাধারণ মানুষের অনুপস্থিতি। দুটো ঘাটতি মেটানোর ক্ষেত্রে সুপ্রকাশ রায়ের বইটি বিবেচ্য। (দ্রষ্টব্য তথ্যনির্দেশ ৮) ইতিহাসে মানুষের ভূমিকা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর মনোভাব ছিল পি.বি. শেলীর কবিতার মতো (সুপ্রকাশ রায়ের বইয়ের শুরুতে উদ্ধৃত)–

Rise like lions after slumber,
In unvanquishable number –
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you –
Ye are many, They are few.

শাসক-শোষক হয় অঙ্গুলিমেয়, আর শোষিত হয় অগণন। সংখ্যার আধিক্যে শোষিত প্রবল, চেতনার জাগরণ হলে, শোষকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শোষিতের জয় অনিবার্য। এমন একটি চেতনা থেকে আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যয়ী উচ্চারণ ছিল, 'বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত– শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।'

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪-এ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে বলেছিলেন, 'শোষিত বাঙালির ইতিহাস আমি যতটা পড়েছি তাতে জেনেছি হাজার বছর ধরেই বাঙালি দুঃখী, অভাবী। তার বিত্ত নাই, বেসাত নাই। হাতে পয়সা নাই। ... মনে হয় শায়েস্তা খাঁর আমলেও বাঙালি কাঙালিই ছিল। সস্তা হলেও কোন জিনিস সে কিনতে পারেনি। ... বাঙালির বিশেষ করে কৃষিজীবী মুসলমান বাঙালির হাতে কোন কাঁচা পয়সা থাকতো না। ... এই তো বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক অবস্থা'।[৯]

বঙ্গবন্ধুর পাঠের ইতিহাসে লড়াকু-সংগ্রামী বাঙালির কথা ছিল। ১৯৭১-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিতে বক্তৃতায় মাস্টারদা সূর্যসেনকে স্মরণ করে বললেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তান সূর্যসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কোনো প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। তাঁর কথা বলতে আপনারা ভয় পান। কারণ তিনি ছিলেন হিন্দু। এদের ইতিহাস লেখা, পাঠ করার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাই।' ছাত্রলীগের প্রতি দেওয়া উপর্যুক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু ক্ষোভ জানিয়ে বলেছিলেন, 'তিতুমীর বাঁশের কেল্লা বানিয়ে সংগ্রাম করে শহিদ হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসে তার উল্লেখ নাই।'

বাংলায় ইংরেজ উপনিবেশবাদী শাসন-শোষণের সূচনা ১৭৫৭-এর ২৩শে জুন পলাশী যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার মর্মান্তিক পরাজয়ের মাধ্যমে। কিন্তু ১৭৬০ থেকেই লড়াকু বাঙালির দ্রোহী সংগ্রাম শুরু হয় ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে, শেষ হয় ১৮৫৯-এর নীল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। মাঝে ছিল ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ। লক্ষণীয়, উপনিবেশবিরোধী বাঙালির সব সংগ্রাম ছিল অসাম্প্রদায়িক। এমনিভাবে গড়ে উঠেছিল বাঙালির লড়াকু-সংগ্রামী ঐতিহ্য, যার প্রতিনিধিত্ব করেছিল বঙ্গবন্ধুর সাধনা ও বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রাম। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,' তখন যেন লড়াই-সংগ্রামের বাংলাদেশ কথা কয়ে উঠেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ লড়াকু বাঙালি আর সংগ্রামী নেতা বঙ্গবন্ধুর মিথস্ক্রিয়ার ফসল।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শিক অবস্থান নির্ধারণ করেন ইতিহাস-ঐতিহ্যের পাটাতনে

১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারির রেসকোর্সের প্রায় ১৭ মিনিটের

ভাষণের একটি জায়গায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ।' সংবিধান রচনার সময়ে জাতীয়তাবাদ যুক্ত হয়ে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হয়, যার সব ক'টি বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্ভর।

বাংলাদেশের এমন পথনকশা যে তৈরি হলো, সে সম্পর্কে দুটো মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। এক, বাংলাদেশের ইতিহাস যে আদর্শিক ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে, তার-ই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্তে, যা সংবিধানে অঙ্গীভূত হয়েছিল। কারণ ১২ই অক্টোবর ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গণপরিষদে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমাদের আদর্শ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং সে আদর্শের ভিত্তিতে এদেশ চলবে।'[১০]

প্রাচীন বাংলার পাল আমল (৭৫০-১১৬১) বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত আদর্শের সূচনাপর্ব। বৌদ্ধ পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মকে রাজধর্ম করেননি; ধর্মীয় সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত তৈরি করে রাজকোষের অর্থে হিন্দু প্রজাদের জন্য তারা মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এমন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বিদ্যমান ছিল স্বাধীন সুলতানি আমলেও (১৩৩৬-১৫৭৬)। অবশ্য ১৫৭৬-এ দিল্লিশ্বর সম্রাট আকবর বাংলার স্বাধীনতা হরণ করলেও চালু করেছিলেন 'সুল-হি-কুল' বা সবার জন্য শান্তির নীতি। পাল আমলেও বৌদ্ধধর্মের মন্ত্র ছিল 'সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্ত' অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। এসব ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখি বঙ্গবন্ধুর রাজশাহী ময়দানের ভাষণে (৯ই মে ১৯৭২), সেখানে তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের মানুষ যেন সুখে-শান্তিতে হেসে-খেলে বেড়াতে পারে।

দুই, সবচেয়ে বড়ো কথাটি হলো, বাঙালির ইতিহাসলগ্ন বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নির্মাণ করেছিলেন বাংলার ঐতিহ্যের ভিত্তিতে।

সংবিধানে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শিরোনামে ৮(১) ধারায় বলা হলো, 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা– এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।'

সংবিধানের ৯ ধারায় জাতীয়তাবাদের কথা বলা আছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ-সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। ...আমি শুধু বলতে পারি আমি মানুষ, আমি [আমরা] একটি জাতি। ... জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপরে।'

তবে বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদ ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive); তাতে ছিল না কোনো বিদেশ বা বিদেশি বৈরিতা (xenophobia) এবং তা ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের পাটাতন।

সংবিধানের ১০ ধারায় আছে সমাজতন্ত্র। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।' বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল– 'আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। ...আমাদের সমাজতন্ত্র মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ, এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।' অন্য প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি কমিউনিস্ট নই, কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। পুঁজিবাদ শোষণের হাতিয়ার।' মোদ্দা কথা হলো, বঙ্গবন্ধু বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য ও পরিবেশ অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিলেন।[১১]

গণতন্ত্র সম্পর্কে ১১ ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকায় লাখো জনতার মাঝে সংবর্ধিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২

থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।' ১৯৭২-এর ৪ঠা নভেম্বর বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র সম্পর্কে গণপরিষদে বলেন, 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে।' বঙ্গবন্ধুর 'সেই গণতন্ত্র' করার উদ্যোগ ছিল বাকশাল–শোষিতের গণতন্ত্র, যা বিকশিত হবার আগে ঝরে পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। বাংলাদেশ বিপ্লব সম্ভাবনার পথ দেখলেও সে পথে তাঁকে এগুতে দেওয়া হয়নি।

গণতন্ত্র বাংলাদেশের ঐতিহ্য, প্রাচীনকাল থেকেই। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত আমাদের এ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক বৌদ্ধ গণরাজ্য ছিল, যার রাজা একটি পর্ষদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। জনমত ও ভিন্নমত নীতি নির্ধারণে বিবেচিত হতো। ভূমির মালিকানা যৌথ, একক ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা, বংশানুক্রমিক রাজত্বের ধারণা ছিল না। ৭৫০-এ ক্ষত্রিয় গোপালও প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা মনোনীত/নির্বাচিত হয়েছিলেন। জনসমর্থন/জনপ্রিয়তার কারণে গোপালের শাসন বংশপরম্পরায় ১১৬১ পর্যন্ত চলেছিল।[১২] গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিচারে আমরা পশ্চিমের চেয়ে এগিয়ে। কারণ পশ্চিমে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয় খ্রি.পূ. ৫ শতকের অ্যাথেন্সে। অর্থাৎ আমরা অন্তত একশো বছর এগিয়ে আছি। কাজেই বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্রের শেকড় বাংলা ও বাঙালি ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত। সুতরাং বাংলাদেশকে গণতন্ত্র 'হাওলাত' করতে হবে না, শেকড়ে ফেরার উদ্যোগ থাকলেই হয়।

সংবিধানের ১২ ধারায় বলা আছে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। ব্যাখ্যায় বঙ্গবন্ধুর মন্তব্য দিক নির্দেশক, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না, করবও না। আমাদের শুধু আপত্তি হল এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ... ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।' মনে হয় প্রায়োগিক বিচারে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, যা বাংলার ঐতিহ্য। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার না থাকলে, ধর্মান্ধতা পোষকতা না পেলে, সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলতে পারে না। অসাম্প্রদায়িকতা বাংলার ঐতিহ্য; অসাম্প্রদায়িকতা স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল। কারণ বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে যারা সাম্প্রদায়িক, তারা 'হীন ও নীচ।'

মানুষ ঐতিহ্য আর পরিবেশ-প্রতিবেশের মিথস্ক্রিয়ায় তৈরি। এ ব্যাপারটি আমরা অনেকেই মনে রাখি না; কিন্তু নেতা বঙ্গবন্ধু যে তা মনে রেখেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর জীবনাচারণ এবং কর্ম-কৃতি।

বঙ্গবন্ধুর মর্মন্তুদ লোকান্তরণের পর অন্নদাশঙ্কর রায় যে প্রবন্ধ লেখেন ১৯৭৫-এ তার শিরোনাম ছিল, 'কাঁদো প্রিয় দেশ', যা দক্ষিণ আফ্রিকার উপর লেখা উপন্যাস *Cry, The Beloved Country* থেকে নেওয়া। দেশলগ্ন নেতার অন্তর্ধানের পর লেখা প্রবন্ধের যথার্থ শিরোনাম! ২৯০ দিন নির্জন কারাবাসের পর যখন ঢাকার আকাশে বিমান এলো তখন বঙ্গবন্ধু গুনগুন করে গাইছেন–

নমো নমো, নমো নমো, নমো নমো, তুমি সুন্দরতম।

দেশকে অনেকদিন পর দেখে দেশলগ্ন নেতার স্ফূর্তিতে রবীন্দ্রসংগীতের এমন কলি মানানসই ছিল।

বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষ, প্রকৃতি, ইতিহাস আর ঐতিহ্যের প্রতীক ছিলেন। আর সে কারণে তিনিই একমাত্র বঙ্গবন্ধু, আর কেউ তো বঙ্গবন্ধু হতে পারেননি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. উদ্ধৃত সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১৫।

২. মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মের বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'অসাম্প্রদায়িক মওলানা ভাসানী', *ভাসানী স্মারক বক্তৃতা*, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল, ১৬ই নভেম্বর ২০২১। প্রবন্ধটি থেকে প্রতীয়মান হবে যে, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মের ওপর ভাসানীর প্রগাঢ় ছায়া ছিল।

৩. ডেভিড ফ্রস্টের সাক্ষাৎকারের জন্য দ্রষ্টব্য নূরুল ইসলাম নাহিদ ও পিয়াস মজিদ (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *জয় বাংলা: সাক্ষাৎকার ১৯৭০-১৯৭৫: শেখ মুজিবুর রহমান*, ভূমিকা: শেখ হাসিনা (ঢাকা, চারুলিপি প্রকাশন, ২০২০)।

৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩), পৃ. ১১১।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

৬. ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত তথ্য।

৭. ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত তথ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংবিধানের ৭(১) ধারায় বলা আছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'।

৮. লড়াকু বাঙালির লড়াইয়ের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য অবশ্য পাঠ্য সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলিকাতা, ডিএনবিএ ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭২) এবং সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদক), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬)।

৯. শামসুজ্জামান খান, *বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ*, উদ্ধৃত নাহিদ ও মজিদ, পৃ. ১৬৫।

১০. শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* (ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৫), পৃ. ৩১। গণপরিষদে বঙ্গবন্ধুর সব ভাষণের জন্য বইটি দ্রষ্টব্য। তবে শিরোনামে 'জাতীয় সংসদ' না বলে গণপরিষদ বলা ঠিক হতো। কারণ তখনও সংসদ গঠিত হয়নি।

১১. প্রসঙ্গক্রমে দ্রষ্টব্য যতীন সরকার, *বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য* (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১)।

১২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'গণতন্ত্র ও সুশাসন বিকাশে প্রাচ্যের অবদান', *ড. ওয়াজেদ মিয়া স্মারক বক্তৃতা ২০১০*, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১০।

প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন: প্রথিতযশা গবেষক, ইতিহাসবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও বর্তমানে বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল্‌স (বিইউপি), ঢাকা

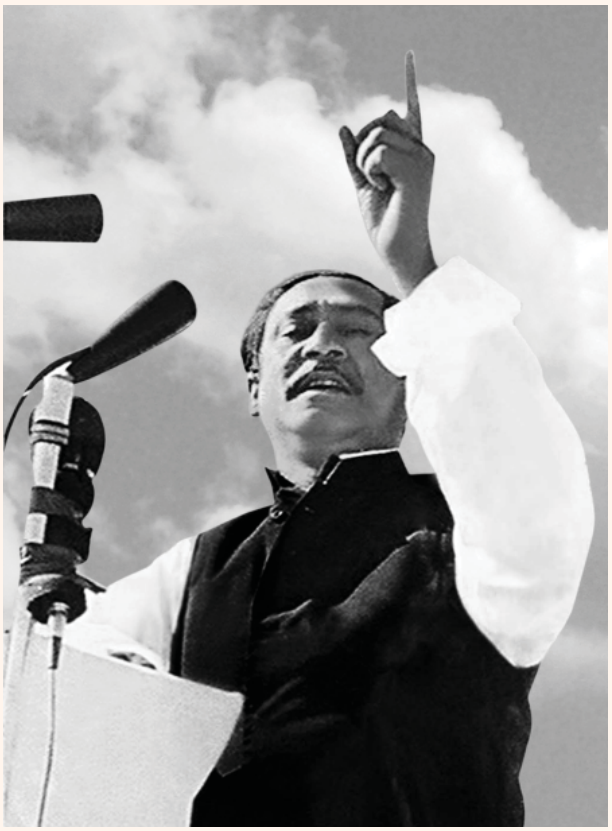

বিষণ্ন বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরা

প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন

বিজয় অর্জিত হয়েছে, কিন্তু কী যেন নেই। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমরা যারা বাংলাদেশে তাদের অনুভব তখন ছিল এরকম। বাংলাদেশ হলো কিন্তু বঙ্গবন্ধু নেই– এ কেমন কথা? তাঁর নামেই তো যুদ্ধ হয়েছে। ৫০ বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনও আবছা আবছা মনে পড়ছে, অনেকে রোজা রেখেছেন, অনেকে নফল নামাজ পড়েছেন, যাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন। পাকিস্তানিরা তো নিষ্ঠুরেরও অধম। আল্লাহ্ কি বাঙালিদের প্রার্থনায় সাড়া দেবেন? সত্যিই সারা দেশের মানুষের মনোভাব ছিল সে রকমই।

হঠাৎ খবর রটে গেল বঙ্গবন্ধু ফিরছেন। মুহূর্তে বিষণ্ন, ক্লান্ত, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাঙালি যেন জেগে উঠল। আমি দেখেছি, স্বজন হারানোর বেদনার পরও তখন অনেকের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। মনোভাবটা ছিল এরকম– তিনি স্বাধীনতা এনেছেন, আমাদের ভার এখন তাঁর ওপর, তিনিই দেখবেন আমাদের।

১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরবেন। ৭ই মার্চ আমরা যেমন ছুটেছিলাম রমনা রেসকোর্সের দিকে, ১০ই জানুয়ারিও ঢাকাবাসী রওয়ানা হলো রেসকোর্সের দিকে। একদল ছুটলো তেজগাঁও বিমানবন্দরের দিকে। তেজগাঁও থেকে রমনা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশেও মানুষজন চাতকের মতো দাঁড়িয়ে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্লেনটি যখন নামল তখন কেউ আর কোনো কিছু মানতে চায়নি। প্লেনের দোরগোড়ায় তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাজউদ্দীন আহমদ ও সহকর্মীদের কান্না। তারপর ট্রাকে করে রমনার দিকে যাত্রা। সেই দৃশ্য এখন বর্ণনা করা দুরূহ। আমরা সৌভাগ্যবান, আমরা রমনা রেসকোর্সে তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ যেমন শুনেছিলাম, ১০ই জানুয়ারির ভাষণও তেমন শুনেছি।

সেই একই উত্তেজনা, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আনন্দ। কারণ, তিনি ফিরে এসেছেন। ১০ই জানুয়ারির ভাষণের পুরোটা এখন হাতের কাছে নেই, সারাংশটি আছে। কিন্তু, বঙ্গবন্ধুর সেই আবেগে ভরা কণ্ঠস্বর মনে আসে। ৭ই মার্চ ছিল দৃঢ়প্রত্যয়, ১০ই জানুয়ারি ছিল উদ্বেগ।

বক্তৃতায় তাঁর মুক্তি পাওয়ার পটভূমি উল্লেখ করেছিলেন। এর পরেও ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে এক সাক্ষাৎকারে সেই প্রসঙ্গে কিছু বলেছিলেন, যা ১৮ই জানুয়ারি (১৯৭২) নিউ ইয়র্কে টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল। ফ্রস্ট তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন–

> এমন শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান এখন ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেন, তখন নাকি তিনি ভুট্টোর কাছে আপনার ফাঁসির কথা বলেছিলেন? এটা কি ঠিক?
>
> শেখ মুজিব : হ্যাঁ, ঠিক। ভুট্টো আমাকে সে কাহিনিটা বলেছিল। ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার সময় ইয়াহিয়া বলেছিল, মি. ভুট্টো, আমার জীবনের সব চাইতে বড় ভুল হয়েছে 'শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি না দেওয়া।'
>
> ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া এমন কথা বলেছিল!
>
> শেখ মুজিব : হ্যাঁ, ভুট্টো একথা আমায় বলে তারপরে বলেছিল, 'ইয়াহিয়ার দাবি ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সে পেছনের তারিখ দিয়ে আমাকে ফাঁসি দেবে।' কিন্তু ভুট্টো তার এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি।
>
> ফ্রস্ট : ভুট্টো কি জবাব দিয়েছিল? তার জবাবের কথা কি ভুট্টো আপনাকে কিছু বলেছিল?
>
> শেখ মুজিব : হ্যাঁ, বলেছিল।
>
> ফ্রস্ট : কী বলেছিল ভুট্টো?
>
> শেখ মুজিব : ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেছিল, 'না আমি তা হতে দিতে পারি না। তাহলে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে। বাংলাদেশে এখন আমাদের এক লাখ তিন হাজার সামরিক বাহিনীর লোক আর বেসামরিক লোক বাংলাদেশ আর ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দি রয়েছে। তাছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অবাঙালি বাংলাদেশে আছে। মি. ইয়াহিয়া, এমন অবস্থায় আপনি যদি মুজিবকে হত্যা করেন আর আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি তাহলে একটি লোকও আর জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত আসতে সক্ষম হবে না। তখন আমার অবস্থা হবে সঙ্কটজনক।' [আবদুল মতিন, *বিজয় দিবসের পর*]

বঙ্গবন্ধু ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়ার আগে ভুট্টো তাঁকে জানান যে, পূর্ব পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ। এবং সে দেশের নেতা হিসেবে তিনি এখন ফিরবেন। তা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কি একটা কনফেডারেশন হতে পারে? একথা জানিয়েছেন ভারতীয় কূটনীতিক শশাঙ্ক ব্যানার্জি যিনি একই বিমানে লন্ডন থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন। উত্তরে কী বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু, জানতে চান শশাঙ্ক ব্যানার্জি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমার জীবনকালে নয়।

১০ই জানুয়ারিতে সেই বক্তৃতায় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দু'দেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। আমি এখন বলতে চাই। জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনার কৃতিত্ব তিনি সাধারণ মানুষকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন– 'আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন।' আরও বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা উদ্ধৃতি করে– 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।' কবিগুরুর এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। বাঙালি জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে। এমন কাজ তারা এবার করেছে যার নজির ইতিহাসে নাই। বক্তৃতার শেষের দিকে বলেছিলেন– 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে।' জোর গলায় বলেছিলেন, 'একজন বাঙালিও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না।'

ইসলামি দেশগুলো পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল–এ তথ্য তখনও হয়ত তাঁর অজানা। কিন্তু ধর্ম যে বাঙালির সত্তায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটি তিনি ভুলেননি। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন জনতাকে– 'আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান, মুসলমান মাত্র একবারেই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না।'

জনগণকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন– 'বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ।'

ইসলামের কথা তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন অন্য কারণে। পাকিস্তান সব সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালিদের শোষণ করেছে, ভয় দেখিয়েছে। আন্দোলন শুরু হলেই পাকিস্তানি নেতারা বলতেন ইসলাম বিপন্ন। বাঙালিরা আঁতাত করছে ভারত বা ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে। ধর্মের দোহাই দিয়ে শাসন করা– এ বৃত্ত তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। নিজে মুসলমান দাবি করলেও তিনি যে বাঙালি তা ভোলেননি এক মুহূর্তের জন্য। যে কারণে বক্তৃতার বিভিন্ন জায়গায় এই কথাগুলো মনে করিয়ে দিয়েছিলেন– 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ। বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।' তারপর বলেছিলেন, 'পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।'

২

অনেকে বলেন, বামপন্থি, ভারত ও সোভিয়েতের চাপে পড়ে তিনি সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন। এখনও অনেকে তাই মনে করেন। এটি ভুল। বঙ্গবন্ধু চীন গিয়েছিলেন ১৯৫২ ও ১৯৫৬ সালে। চীনের অভিজ্ঞতা তাঁর ভালো লেগেছিল। ১৯৭০ সালের আগে ও মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। আমৃত্যু ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন।

সুতরাং সমাজতন্ত্রের কথা তিনি ভেবেচিন্তেই বলেছিলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী পড়লে দেখা যায়, যৌবনেই তিনি সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। সমাজতন্ত্রের ধরনটা যেমন হবে সে সম্পর্কে হয়ত স্পষ্ট চিন্তা ছিল না। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিতে চাই। কারণ, ঐ রকম ঘোষণা ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একেবারে নতুন। আরও পরে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝেন সেটি বিশদভাবে বলেছিলেন– 'বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যাবসা চলবে না। ধর্মের নামে লুট করা চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার-আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না।' সে কারণে তিনি সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য, ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও নিষিদ্ধ করেছিলেন।

তাঁর সমাজতন্ত্রের ভাবনা ছিল অন্যরকম। বলা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। ১৯৭১-এর আগে ও পরে এ দুটি প্রত্যয় নিয়ে তিনি বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। এ কারণে, যে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শনের এ দুটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

চীনের আদর্শ, কমিউনিস্ট আদর্শ ছাড়া, তারা যে কাজ করেছে সেগুলো তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ওই যে নতুনভাবে সব করার চেষ্টা এটিই ছিল তাঁর কাছে আকর্ষণীয়। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছে সে দেশটিকে তিনি এভাবেই গড়তে চেয়েছেন, নতুনভাবে চিন্তা করতে চেয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের এটি পছন্দ ছিল না। মুসলিম লীগপন্থিদের তো নয়ই। এমনকি মুজিব যাদের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন, তারাও নয়। তবে মুসলিম লীগ নেতাদের থেকে তারা প্রাগ্রসর ছিলেন। আওয়ামী লীগের যাঁরা গিয়েছিলেন চীন সরকারের কাজকর্ম তাদের ভালো লেগেছিল। তবে মুজিব তাঁদের থেকে এগিয়ে ছিলেন। কীভাবে? তাঁর কয়েকটি উদাহরণ দেবো।

আগেই বলেছি, চীন সফরের পর চীন ও বিশ্বশান্তি নিয়ে তিনি যে দু-একটি মন্তব্য করেছিলেন তা পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভালো লাগেনি। পূর্ববঙ্গে এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। লাহোরের সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট মন্তব্য করেছিল–আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান বলেছেন, চীনারা বিশ্বশান্তির সঙ্গে যুক্ত। যে লোকটি পিকিংয়ের বাইরে যায়নি [মিথ্যা কথা], চীনা ভাষা জানেন না, তিনি চীনাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন কী করে? তাঁর বক্তব্য এ দেশের মূল আদর্শবিরোধী। কেননা তিনি কমিউনিস্টদের পক্ষে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছেন। 'It is preposterous for a man who perhaps never stopped the corporation limit of Peking to pronounce a verdict on what the Chinese people think and feel, specially when he does not know a word of chinese… it is an insult to

the basic ideology of this state whose citizenship Mr. Mujibur Rahman is abusing for false procommunist propaganda to suggest that future of humanity lies in the hands of that immortal cult…' [*সিক্রেট ডকুমেন্টস* ১৯৫২, ৭.৪.৫২] পাকিস্তান বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তান এভাবেই সবাইকে বিচার করত। পাকিস্তানই ইসলাম–এছাড়া অন্য কিছুতে তাদের বিশ্বাস ছিল না। পূর্ববঙ্গের মানুষ এতটা অন্ধ ছিল না, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে ছিল স্পর্শকাতর।

অন্যদের কথা বাদ দিই। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দীরও বিরূপ ধারণা ছিল কমিউনিস্টদের প্রতি। ১৯৫৩ সালে সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে কড়া একটি চিঠি লেখেন ভাষা আন্দোলন নিয়ে। সেখানে পররাষ্ট্রনীতি নিয়েও তাঁর কিছু মন্তব্য ছিল। লিখেছিলেন তিনি, মওলানা সাহেব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবসের ডাক দিয়েছেন। আরব দেশগুলোর প্রতি পাশ্চাত্যের মনোভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ হয় এই আহ্বান। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়াও যে তার তাঁবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদী আচরণ করছে তার বিরুদ্ধে কোনো কথা নেই। 'তোমাকে অনুধাবন করতে হবে এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। মনে হচ্ছে, এখন তোমরা সবাই পরোক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামো ও রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। তোমরা এখন যাদের বলা হয় প্রগতিশীল দল ও কমিউনিস্টদের সমর্থন পাচ্ছ, আমাদের লোকদের প্রতিক্রিয়া হলো, এটিকে সবাই বলে ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট পার্টি।' অনেকে এ ধারণা থেকে পার্টি ছেড়ে যেতে পারে। 'তুমি কি মনে কর এই দিবস পালন করে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বেড়েছে। তুমি অন্যদের মাঠ দখল করার সুযোগ করে দিচ্ছ। একটু আস্তে চলা যায় না? আন্তর্জাতিক রাজনীতির জন্য যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের দলকে আগে শক্তিশালী করা উচিত, যাতে আমরা জিততে পারি। তোমরা যেভাবে প্রভাবিত হয়েছ কমিউনিস্টদের দ্বারা, তাতে আমার ধারণা আমার কথা ভালো লাগবে না। আরেকটি বিপদ আছে। পাকিস্তানের ভেঙে যাওয়া। বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি তোমাকে সহায়তা করবে না।' [*ঐ*]

এ ছিল পরিস্থিতি। রাজনৈতিকভাবে সমাজতন্ত্রের [চীন/রাশিয়া] কথা বলা ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন। সেসময় মুসলিম লীগের রাজনীতি বর্তমান বিএনপি-জামায়াত রাজনীতির মতোই ছিল। এর বিপরীতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মীরা ছিলেন ত্যাগী ও সৎ। এ গুণটি বঙ্গবন্ধুকে আকর্ষণ করেছিল। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও শামসুজ্জামান খান। সেখানে ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ছিলেন। তারা অভিযোগের সুরে বলছিলেন, 'আপনি ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনেও তো গেলেন। তিনি বললেন–'তোমাদের কাজে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি না সব সময়। ছাত্র ইউনিয়নের ওরা পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, ত্যাগী। ওরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সিডবেড করে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজদের যুক্ত করেছে। আমি একটিমাত্র জাতীয় পার্টি [বাকশাল] করছি। ত্যাগী সৎ লোকেরা কাজের মাধ্যমে সেই পার্টির সামনের কাতারে আসবে। অকর্মণ্য গলাবাজরা পিছনে পড়বে। দেখ না আমি আলতাফ সাহেবকে মন্ত্রী করেছি। এমন একটা লোক পাওয়া ভাগ্যের কথা'। [*আলাপ*] ছেলেবেলা থেকেই তিনি গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কমিউনিস্টরাও শ্রমিক- কৃষকদের কথা বলে। সুতরাং তিনি কমিউনিস্ট না হলেও এ ভাবধারার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৫২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগে অনেক সময় ডানপন্থিরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু সব সময় পার্টিকে মধ্য বা মধ্যবামে রেখেছেন।

চীনে তাঁর আগ্রহ ছিল কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানার। বা যে সমস্যাগুলো তিনি পাকিস্তানে আছে বলে মনে করেছেন তার মীমাংসা কীভাবে মাও সেতুং করেছেন তা জানার। বিষয়গুলো হলো ভূমির মালিকানা, শ্রমিকের মজুরি ও ধর্মনিরপেক্ষতা। একটি আদর্শিক রাষ্ট্র গড়তে হলে এ বিষয়গুলোর সমাধান দরকার। ১৯৫২ থেকে ১৯৭২–দীর্ঘ দু'দশক। এ দু'দশক তিনি তার দলের কর্মী-নেতাদের প্রস্তুত করতে চেয়েছেন, একইসঙ্গে এ বিষয়গুলো পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে কীভাবে সমাধান করতে হবে। আমি এসব বিষয়ে বিভিন্ন সময় তাঁর বক্তব্যগুলো তুলে ধরব তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, চীনের সাধারণ মানুষ হতদরিদ্র; এর অর্থ অবস্থা আগে আরও খারাপ ছিল কিন্তু মাও সেতুং সে অবস্থার পরিবর্তন করেছেন। এ বিষয়টি তাঁকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল সভায় সাংগঠনিক রিপোর্টে বলেছিলেন–'শোষকের ওপর শোষিতের সংঘাত ভঙ্গুর ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শোষণের কেন্দ্রগুলোর ওপর আক্রমণই আমাদের প্রথম কাজ। পণ্য হিসেবে নয়–মানুষ মানুষের পরিপূর্ণ মর্যাদা লইয়া বাঁচিতে চায়। আওয়ামী লীগ এই বাণী লইয়া বঞ্চিত মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই মানবিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার শপথই আওয়ামী লীগের কর্মসূচির মধ্য দিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে জাতির সম্পদের উপযুক্ত উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্য দিয়াই উহার সংকটের অবসান করিয়া মানুষের সমৃদ্ধি রচনা করিতে হইবে।' ওই সময়ে যেসব দল প্রকাশ্য রাজনীতি করত তাদের কোনো নেতা এ ধরনের কথা বলতে পারেননি।

কৃষকের সঙ্গে যুক্ত ভূমি। বঙ্গবন্ধু দেখিয়েছেন, চীনে লাঙল যার জমি তার– এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। কৃষকদের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার উপায় সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদারি প্রথাও বিলুপ্ত হয়েছিল।

১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা দিবসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন– বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে সমবায় বা কো-অপারেটিভ করতে হবে।

'এর জমি মালিকদের জমি থাকবে, কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি বেকার প্রত্যেকটি মানুষ যে কাজ করতে পারে, তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যারা টাউট আছে, তাদের বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশ থেকে এক হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসরি কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।' [*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯৭৫]

চীন যাওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ সাল থেকে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তের দাবি করছিলেন এবং তা লুপ্ত করা হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে কাউন্সিল মিটিংয়ে তিনি বলেছিলেন–'আমরা ভূমি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থার সাথে সাথে শিল্পায়ন প্রচেষ্টাও আমাদের সংগঠিত করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যের বাজার, নিয়োজিত মূলধনের জোগান হিসেবে আমাদের দেশকে ব্যবহার করিয়াছে বলিয়াই আমাদের কৃষি ও শিল্পের এই দুর্গতি।' [*কাউন্সিল*]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চীনে কীভাবে মাও সেতুং বন্ধ করেছিলেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মেছিল বঙ্গবন্ধুর। তাঁর উপলব্ধি ছিল, রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে দাঙ্গা লাগাতে পারে, বন্ধ করতেও পারে। ১৯৫০ সালে মুসলিম লীগ দাঙ্গা লাগিয়েছিল। আরও পরে বিএনপি-জামায়াত আমল দেখুন। এরশাদ আমল দেখুন, কতবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাঁর ধর্মমতের সঙ্গে এর কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। ইসলাম এর বিরোধী। সুতরাং এর বিরোধিতা করা ধর্মীয় নীতি পালন করাও বটে। ১৯৫৩ সালে কাউন্সিল সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'গণতান্ত্রিক শক্তি [আওয়ামী মুসলিম লীগ] বুঝিয়াছে যে, গণ-আন্দোলনকে ব্যাহত করিবার ইহা গণদুশমনদের একটি হাতিয়ার মাত্র। আর তাদের এই হাতিয়ারকে ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়া। মানুষের এই চেতনাই ১৯৫০ সালে দাঙ্গার শিক্ষা।' [*ঐ*] তিনি আরও বলেন, ১৯৪৯ আর ১৯৫৩ ভিন্ন। তাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধকে তারা আজ আর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ বলে মনে করেন না।

শেখ মুজিব লক্ষ করেছিলেন, চীনারা আমেরিকাকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে। বঙ্গবন্ধুর কাছে ব্রিটেন ছিল কাছের, আমেরিকা দূরের। পাকিস্তান তখন কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৩ সালে সেই কাউন্সিল সভায় তিনি ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগ কৃষ্টি ও শিল্পে প্রগতিবাদী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যা সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার একান্ত পরিপন্থি। তাই আওয়ামী লীগ শুধু কমনওয়েলথ নয় সাম্রাজ্যবাদী জোটের সঙ্গে সম্পর্কহীন সক্রিয় নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করছে এবং আওয়ামী লীগ এখন থেকে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির মহান নেতা।

ওই সময় আওয়ামী লীগ নেতা ভাসানীও ঘোষণা করেছিলেন, অধিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, জমিদারি উচ্ছেদ করতে হবে, পাট ও প্রধান শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু চীন গিয়েছেন দুবার ১৯৫২ এবং ১৯৫৬ সালে। আবার চৌ এন লাইও এসেছিলেন ঢাকায়। অর্থাৎ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত চীনা নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের চীন ভ্রমণ সম্পর্কে তিনি লিখে যাননি। তবে ওই চার বছর চীনের মৌলনীতির পরিবর্তন হয়নি। দেশেরও উন্নতি হচ্ছিল। প্রথম চীন ভ্রমণ তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর মন্তব্য নেই বললেই চলে। যদিও সমাজতন্ত্রের প্রতিভূ তখন চীন ও রাশিয়া। এর কারণ বোধ হয় রাশিয়ায় না যাওয়া। আর রাশিয়াও 'তাঁবেদার রাষ্ট্র' সৃষ্টি করে সাম্রাজ্য গড়াচ্ছে। সোহরাওয়ার্দীর এই মন্তব্যও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে। 'সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি তার এক দশকের মধ্যেই চালু হয়ে যায়।

আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সে সম্পর্কেও মন্তব্য নেই। তাছাড়া চিরদিন সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তিনি বলে এসেছেন। আমেরিকা তাঁর প্রতিভূ। অনুমান করতে পারি, আমেরিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। গণতন্ত্রের কথা তো তিনি চিরদিন বলে এসেছিলেন। আর মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে লড়াই তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যই লড়াই।

৩

১৯৭১ সালের ঘটনাবলি কিছুটা হলেও তাঁর মনে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। চীন তাঁর মানুষের বিরুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্রও তা-ই। কিন্তু চীনের বিষয়টিকে কি তিনি মানতে পেরেছিলেন? অন্যদিকে যে সোভিয়েতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না, সেই সোভিয়েতের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েছিল এবং সোভিয়েত তো সমাজতন্ত্রেরই ধারক। সুতরাং সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর আপোশ করতে হয়নি। আর আমেরিকা বিরোধিতা করবে কিন্তু তার সঙ্গেই বসবাস করতে হবে।

১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ৩২ নম্বরে যান। শামসুজ্জামান খান ছিলেন সেই দলে। তিনি লিখেছেন, 'একজন বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে তো চীন বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি। বঙ্গবন্ধু বললেন–'দুটো বিষয় তো আলাদা, মাও একজন বড়ো নেতা। জীবনে বহু সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবন ও চিন্তাটা জানা ও বোঝা দরকার। একটা অনুন্নত বিশাল দেশকে তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। সে দেশটায় এত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কত উন্নত হয়েছে। এই ব্যাপারটা কীভাবে ঘটেছে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ তাঁর মুখে একটু বেদনার ছায়া পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, রাজনীতি বড়ো জটিল, নিষ্ঠুর। এর ফলে কত অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। তা না হলে চীনের আমাদের সমর্থন না করার ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিই নেই। চীন খুব অন্যায় কাজ করেছে।' [বিস্তারিত, *আলাপ*]

আমেরিকান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের মি. মরিশাসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন–'আমি সোভিয়েত ও ভারতের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি–কেননা এই দুটি মহান দেশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করেছে।' [বিস্তারিত : *এবিসি*]

যে ধারণাগুলো চীন থেকে নিয়ে এসেছিলেন তার দুটি দিক ছিল–এক. তাত্ত্বিক, দুই. ব্যাবহারিক। তাত্ত্বিক দিক থেকে অসুবিধা ছিল না। সমাজতন্ত্রের মূলনীতিই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। 'মাও-এর চিন্তাধারা' তখন ব্যাপ্তি পায়নি সুতরাং সে ধারণা তাঁর মানসজগতের বাইরে ছিল। আমি কয়েকটি ধারণা দিই :

১৯৬০-এর দশকের আগে জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য শোষণহীন সমাজের কথা বলেছেন। পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের দাপট, বৈষম্য তাঁকে অস্থির করেছে। ষাটের দশক থেকে দেখি সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকদের বিষয়টি তিনি আলোচনায় নিয়ে আসছেন এবং ১৯৭০ সালের দিকে এ বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি জানতেন, তিনি এখন চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবেন এবং যে রাষ্ট্র তিনি গঠন করতে চাইছেন তার একটা নীতি থাকতে হবে। আদর্শ রাষ্ট্রের খোঁজ করছেন আজীবন, অবশেষে আদর্শ রাষ্ট্রের খোঁজ পেয়েছেন। ১৯৭০

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২

সালে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে [৪-৫ জুন] ঘোষণা করা হয়–

'সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রবর্তন (ভূমিকা) : ক. একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, জমিদার জায়গিরদারি, সরদারির বিলোপ সাধন করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে মানুষের মর্যাদায় সমুন্নত করা; খ. ন্যায়পরায়ণতার আলোকে মানুষে-মানুষে এবং অঞ্চলে-অঞ্চলে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নয়া শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মাধ্যমে দেশে বিপ্লব সাধনই হবে আওয়ামী লীগের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।' (কাউন্সিল, পৃ. ১২৮]

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন– 'রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু তাই নয় তাঁর লক্ষ্য হবে শোষণমুক্ত দেশ তথা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা।' [এই দেশ]

কলকাতায় গেলেন মার্চ মাসে। ৬ই মার্চ ১৯৭২ সালে কলকাতার ব্রিগেড গ্রাউন্ডে বললেন–অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেন– 'ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপনার মিল কেন? আমাদের মিল আদর্শের মিল, তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, আমিও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, আমিও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি, শ্রীমতী গান্ধীও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন। আমরা উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী... আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাব।

এ বিষয়টি আরও বিশদ করে ১৯৭২ সালে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামো স্থাপনে এ দিন তিনি জাতীয়করণের গতি ঘোষণা করেন। উপমহাদেশে এ ধরনের ঘটনা ছিল প্রথম। ইন্দিরা গান্ধীও ব্যাংক-বিমা জাতীয়করণ করেছিলেন, আরও পরে। নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ভারত গ্রহণ করে পরে।

বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেছিলেন–

> আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। অবাস্তব তালিকা নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তবিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভাঙিয়া নতুন সমাজ গড়িতে হইবে। শোষণ ও অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ আমরা গড়িয়া তুলিব এবং জাতির এই মহাক্রান্তি লগ্নে সম্পদের সামাজিকীকরণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচির শুভ সূচনা হিসেবে আমার সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জাতীয়করণ করিতেছে :
>
> ১. ব্যাংকসমূহ (বিদেশি ব্যাংকের শাখাগুলো ভিন্ন)
> ২. সাধারণ ও জীবন বিমা কোম্পানিসমূহ (বিদেশি কোম্পানি শাখাসমূহ ভিন্ন)।
> ৩. সকল পাটকল
> ৪. সকল বস্ত্র ও সুতাকল
> ৫. সকল চিনিকল
> ৬. অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌযানের বৃহদাংশ
> ৭. ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ও তদূর্ধ্ব সকল পরিত্যক্ত ও

অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি।

৮. বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে সরকারি সংস্থা হিসেবে স্থাপন করা হইয়াছে।

৯. সমগ্র বহির্বাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য নিয়ে সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্যের বৃহদাংশকে এই মুহূর্তে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আনা হইয়াছে। [*ইত্তেফাক*, ২৭.৩.১৯৭২]

অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবন করেন তখন বলেছিলেন– 'একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন করতে সক্ষম বলে ধীরে ধীরে তা প্রবর্তন করতে হবে।' তিনি আরও বলেন– '... যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমরা বলেছি সে অর্থনীতি আমাদের, সে ব্যবস্থা আমাদের। কোন জায়গা থেকে হায়ার করে এনে, ইম্পোর্ট করে এনে কোন 'ইজম' চলে না। এদেশে, কোন দেশে চলে না। আমার মাটির সঙ্গে, আমার মানুষের সঙ্গে আমার কালচারের সঙ্গে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে, আমার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমার ইউনিক সিস্টেম গড়তে হবে।' [বিস্তারিত, *কাউন্সিল*]

১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি জনসভায় তিনি শ্রমিক-কৃষকের ব্যাপারটি এনেছেন। যেমন– ১৩ই জুন ১৯৬৪ সালে এক জনসভায় বলেন, পাকিস্তানি ব্যবস্থায় শিল্পপতিরা করমুক্ত আর কৃষক করভারে জর্জরিত। আসলে হওয়া উচিত তো উলটো।

১৯৬৬ সালের ৯ই অক্টোবর দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের এক কর্মীসভায় পার্টির মেনিফেস্টোতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ, অন্তর্ভুক্তিকরণ অভিনন্দিত করা হয়।

১৯৫০ থেকে যা ভেবেছেন, ২১ বছর পর ১৯৭২ সালে সেসব ধারণা তিনি কার্যকর করতে চাইলেন। বিষয়টি এভাবে বিবেচনা করা যায়, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ, বিভিন্ন আদর্শের সঙ্গে পরিচয়ে তিনি নতুন দেশের জন্য কী করবেন তার একটা ধারণা মনে তৈরি করেছিলেন।

২৭শে মার্চ ১৯৭২ সালে শ্রমিক সমাবেশে বলেন, 'শ্রমিক ভাইদের বলি শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমানকাল ধরিয়া যেই পরস্পরের বিরোধিতা রহিয়াছে তা আমাদের নতুন নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ হইতে অনেকখানি বিলুপ্ত হইবে। শ্রমিক কর্মচারীকে আর সর্বদা মালিকের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত থাকিতে হইবে না।' চীনে তিনি দেখেছিলেন শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিক একসঙ্গে বসে কারখানার কর্মসূচি গ্রহণ করছেন।

ডাকসু'র আজীবন সদস্যপদ যখন তাঁকে দেওয়া হয়– ৬ই মে ১৯৭২ সালে তখন বলেছিলেন–

'রাতারাতি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সমাজতন্ত্রের বিরোধী ঘাঁটিকে ধ্বংস করে দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে আসতে হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কোনো প্রকার দরকষাকষির স্থান নেই। সকল কলকারখানার মালিক শ্রমিক শ্রেণি ও দেশের জনগণ।' [এই দেশ]

বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক রাষ্ট্র স্থাপনের বিষয়টি আগেই উল্লেখ করেছি। চীন ভ্রমণের সময় তিনি লিখেছিলেন, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি তাঁর ভালো লাগেনি। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দুটিই তিনি চান। ১৯৭২ সালের দিকে তাঁর মনে হয়েছে তিনি ঐ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন। সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে [৬.৭.১৯৭২] তিনি তাঁর ভাষণে বলেন–

'আমি জানি আমার মতো আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুনিয়ায় দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের খাতিরে বাধা দৃঢ় করবার জন্য রূঢ় হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। এজন্যে যে আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না, আমি চেষ্টা করে দেখছি।' [বিস্তারিত, *বঙ্গবন্ধুর দর্শন*]

সংবিধান বিলের ওপর ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সালে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন বঙ্গবন্ধু। সেখানে বলেন–

'সমাজতন্ত্রের মূলকথা হলো শোষণহীন সমাজ। সেই দেশের কী climate, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা সব কিছু বিবেচনা করে স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে...।'

তিনি আরও বলেছেন–

'সমাজতন্ত্র কায়েমে সবাই এক পন্থা গ্রহণ করেনি। চীন একরকম করেছে, রাশিয়া অন্যরকম, রুমানিয়া, যুগোস্লোভিয়া বা বুলগেরিয়া তাদের দেশের সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্র কায়েম করেছে।'

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন–

'একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু, আমরা ডায়াসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম করেছে, তারাও আজ পর্যন্ত তা করতে পারে নাই– আমি চ্যালেঞ্জ করছি।'

আওয়ামী লীগের এক দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলেও তিনি দীর্ঘ এক বক্তৃতা দেন। সেখানে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যা বলেন, তাতে মনে হয় তাঁর এই প্রতীতি জন্মেছিল আওয়ামী লীগ দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম দুরূহ। বাকশালের দিকে তাই তিনি এগিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কায়েমের সমস্যা এইভাবে সমাধান করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, 'এ দেশ স্বাধীন তোমরা করেছ। এবার বাংলার মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। দিতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি, সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সমাজতন্ত্র ছাড়া রাস্তা নাই। শোষণহীন সমাজ গাছ থেকে পড়ে না। শোষণহীন সমাজ বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়তে হলে আমার কর্মীভাইদের সমাজতন্ত্রের কর্মী হতে হবে। ক্যাডার তৈরি করতে হবে। ট্রেনিং দিতে হবে। না হলে পারব না কিছু করতে।

'সমাজতন্ত্রে আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে যাবার চাই এবং আমরা দুনিয়াকে দেখাতে চাই যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় নতুন সিস্টেমে আমরা শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলব।' [*বঙ্গবন্ধুর দর্শন*]

চীনে তিনি যেমন দেখেছিলেন মালিক-শ্রমিক মিলে পরিকল্পনা করে কারখানা চালায় তেমনি ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের সময় বলেছিলেন– 'শ্রমিক ভাইয়েরা আমি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান করেছি। আপনাদের প্রতিনিধি ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট, লেবার ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি বসে একটা প্ল্যান করতে হবে। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কী করে আমরা বাঁচতে পারি তার বন্দোবস্ত করতে হবে।'

৪

আজীবন বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে বড়ো হয়েছেন এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ছেলেবেলায় জাতিগত কারণে ১৯৪৬, ১৯৫০ এবং তার পরবর্তী সময়ের দাঙ্গা দেখেছেন। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় কলকাতায় এবং ১৯৬৪ সালে ঢাকায় দাঙ্গা নিবারণে প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন।

বায়তুল মোকাররমে ২৭শে এপ্রিল [১৯৭২] মিলাদুন্নবি পালন উপলক্ষে বলেন– ধর্মনিরপেক্ষতা সরকারের নীতি। এর অর্থ এ নয় যে কাউকেও ধর্মচর্চা করতে দেওয়া হবে না। অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা ইসলামের নীতি নয়। [*ইত্তেফাক*, ২৯.৪.১৯৭২]

সংবিধান বিলের ওপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি আরও স্পষ্ট করেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।... আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করব না।...ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।'

২৮শে এপ্রিল ১৯৭২ সালে বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান সরকারের নীতি ইহার অর্থ এই নয় যে, কাহাকেও ধর্মচর্চা করতে দেওয়া হইবে না। অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা ইসলামের নীতি নহে।' তিনি আরও বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না।' অর্থাৎ এক কথায়, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। [*ইত্তেফাক*, ২৯.৪.১৯৭২]

খন্দকার ইলিয়াসকে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ১৯৭২ সালে 'জিন্নাবাদ এ দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিষবাষ্প। তার জবাবে আমি বলি যার যার ধর্ম তার তার–এরই ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা।'

চীনে এই কারণেই তিনি বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চেয়েছেন। তাদের মনোভাব বুঝতে চেয়েছেন। ১৯৯০ সালে যখন চীনে যান, তখনো এ খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেদিক থেকে দেখলে এ ক্ষেত্রে ১৯৫২ সালে চীনে যে নীতি ছিল, ধর্ম সম্পর্কে ১৯৯০ সালেও তা-ই ছিল। মুসলমানরা বঙ্গবন্ধুকে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন, তাদের ধর্মকর্মে বাধা দেওয়া হয় না। বরং ধর্মের নামে যে শোষণ তা বন্ধ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুও তা-ই চেয়েছিলেন। তাঁর আমলের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন। তিনি আরেকটি বিপ্লবী কাজ করেছিলেন, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। চীন ছাড়া আর কেউ ওই সময়ে এ কাজ করার সাহস পায়নি।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে তিনি বলেছেন, 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী এবং সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। সমাজ তো চাট্টিখানি কথা নয়। এ দেশের বাস্তবিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ, অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ কাঠামো আমাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। শুভ সূচনা হিসেবে আমরা উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো জাতীয়করণ করছি।' কৃষকদের খাজনা চিরদিনের [২৫ বিঘার কম] জন্য মওকুফ করেছেন। তিনি সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চান এবং সোনার বাংলায় থাকবে শোষণমুক্ত সমাজ। শ্রমিকদের বলেছেন [২৭শে মার্চ ১৯৭২], 'শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমানকাল ধরিয়া সেই পরস্পরের বিরোধিতা রহিয়াছে। তা বিলুপ্ত করা হবে।'

সমাজতন্ত্র পছন্দ করেন কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট নন। তিনি পুঁজিবাদে বিশ্বাসী নন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এই কন্ট্রাডিকশন কীভাবে মেটাবেন তার একটি ফর্মুলা তিনি করেছিলেন। ১৯৭২ সালের আগস্টে এক বক্তৃতায় চার মূলনীতি যেন সবাই সমর্থন করেন এই নিশ্চয়তা চেয়ে তিনি বলেন– 'এই চার নীতির ভিত্তিতে দেশ গড়তে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা একটি নতুন ইয়ে দিয়েছি যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায় কিনা তা আমরা চেষ্টা করেছি। আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি কারণ দেখা যায় সমাজতন্ত্র করতে গেলে অনেক সময় বাধার সৃষ্টি হয়। মানুষ চটানোর জন্য এটা করতে চাচ্ছি না এই জন্য যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। দেখছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র হবে কিনা এবং চেষ্টা করে দেখছি বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার ভিত্তিতে আবার আন্দোলন, এ না থাকলে আমার স্বাধীনতার ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। আর ধর্মনিরপেক্ষতা আমার রয়েছে।'

খন্দকার ইলিয়াসকে এসব প্রসঙ্গে তিনি আরও অনেক কথা বলেছিলেন যা এ বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন–'এদেশে চিরদিন আমলা, টাউট, মহাজন বা ফড়িয়া পুঁজিবাদের শোষণ চলেছে। শোষণ চলে ফড়িয়া বাজারি ও পুঁজিবাদের। শোষণ চলে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের। এদেশের সোনার মানুষ, এদেশের মাটির মানুষ শোষণে শোষণে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের মুক্তির পথ কী? এই প্রশ্ন আমাকেও দিশেহারা করে ফেলে। পরে আমি পথের সন্ধান পাই। আমার কোনো কোনো সহযোগী রাজনৈতিক দল ও প্রগতিশীল বন্ধুবান্ধব বলেন, শ্রেণি সংগ্রামের কথা। কিন্তু আমি বলি জাতীয়তাবাদের কথা।

সেই সঙ্গে বলি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সমাজতন্ত্র চাই। কিন্তু রক্তপাত ঘটিয়ে নয়–গণতান্ত্রিক পন্থায়, সংসদীয় বিধিবিধানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

আমার এই মতবাদ বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করেই দাঁড় করিয়েছি। আমি মনে করি, বাংলাদেশকেও অগ্রসর হতে হবে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র–এই চারটি মূল সূত্র ধরে, বাংলাদেশের নিজস্ব পথ ধরে।' [বিস্তারিত, *প্রশ্ন*]

জাতীয়তাবাদ ও উগ্র-জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তিনি তাঁর ধারণা স্পষ্ট করেন। 'জাতীয়তাবাদ উগ্রতা কিংবা সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হলে হিটলারের জার্মানি, মুসোলিনির ইতালি, ডক্টর ভেরউডের দক্ষিণ আফ্রিকা, পাঞ্জাবি খানদের পাকিস্তান বা ইসরাইলের ইহুদিবাদের মতো অতি জঘন্য রূপ ধারণ করতে পারে। সে জাতীয়তাবাদ দক্ষিণপন্থি ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ। কিন্তু আমার জাতীয়তাবাদ বামপন্থি ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ। নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিবাদী পাঞ্জাব, বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইহুদিবাদের মতো উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের চরিত্র ও তার বিকাশধারা লক্ষ করলে দেখতে পাবেন যে, একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ

এবং আমলাতন্ত্রবাদ ও জঙ্গিবাদ, উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মূল শক্তি। তারা গণতন্ত্রেরও শত্রু, সমাজতন্ত্রেরও শত্রু। তাদের জাতীয়তাবাদ শোষকদের জাতীয়তাবাদ। আমার জাতীয়তাবাদ শোষিতের জাতীয়তাবাদ। কারণ, আমার জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে রয়েছেন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত আওয়ামী লীগ। কাজেই যে জাতীয়তাবাদ আমার মতবাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ, সেই বিপ্লবী ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হবার কোনো ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বাস্তব কারণ নেই।' [ঐ]

চীন ভ্রমণ করে বঙ্গবন্ধু আকৃষ্ট হয়েছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি এ ধরনের সরল ধারণা করা বোধ হয় ঠিক নয়। তাঁরা যখন তরুণ, প্রধানত মওলানা ভাসানী ও শামসুল হকের নেতৃত্বে কাজ করছেন এবং বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ চাচ্ছেন তখন তাঁরা এ বিষয়গুলোর প্রতি সচেতন হন। এই শব্দগুলোর মাঝেই তাঁরা নতুন ভূমির সন্ধান পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তারপর চীন গেছেন দুবার। রচনা করেছেন নয়াচীন ভ্রমণ সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপি। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বোধ হয় ধারণাটি পাকাপোক্ত হয়েছিল দুঅঞ্চলের বৈষম্যের কারণে। এ বিষয়ে বিনায়ক সেন এক ধারাবাহিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। [তুমুল গাঢ় সমাচার]

১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রেও এর উল্লেখ ছিল– 'আওয়ামী লীগের আদর্শ শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই বর্তমানের শোষণ, বৈষম্য ও দুর্দশার হাত থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।' এখানেই বলা হয়েছিল, জাতীয়করণ ও একচেটিয়া ব্যাবসা বাতিলের কথা।

৫

১৯৭২ সালে সংবিধানে সমাজতন্ত্র মূলনীতি হলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় [১২.১০.১৯৭২] বলেছিলেন–

'এবং যতদূর সম্ভব, যে শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়েছে, সেটা যে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে, তা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের আদর্শ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং সে আদর্শের ভিত্তিতে এদেশ চলবে। জাতীয়তাবাদ–বাঙালি জাতীয়তাবাদ–এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চলবে বাংলাদেশে। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির রক্ত দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদ। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে। যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষক শ্রেণি আর কোনোদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। এবং সমাজতন্ত্র না হলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ৫৪,০০০ বর্গমাইলের মধ্যে বাঁচতে পারবে না। সেজন্য অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক। আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। ... কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বাংলার মানুষ ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে বাংলার বুকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। ... এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার শাসনতন্ত্র তৈরি হবে। এটা জনগণ চায়, জনগণ এটা বিশ্বাস করে। জনগণ এজন্য সংগ্রাম করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক এই জন্য জীবন দিয়েছে। এই আদর্শ নিয়েই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে।'

বিনায়ক সেন ড. কামাল হোসেনের উদ্ধৃতি এবং নিজের মন্তব্য যোগ করে তা স্পষ্ট করেছেন। সে কারণে, উদ্ধৃতিটি বড়ো হলেও তুলে ধরছি–

১. অনুন্নত দেশের পটভূমিতে 'সমাজতন্ত্র' আর উন্নত পুঁজিবাদী দেশের 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর মধ্যে পার্থক্য আছে : 'আমাদের কাছে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি। সমাজতান্ত্রিক সমাজ বলতে আমরা বুঝি এমন এক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে জাতিকে এবং জাতীয় অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যে আত্মত্যাগের প্রয়োজন, সকলে তা ভাগ করে নেবে। আবার সকলের প্রচেষ্টায় যে সম্পদ গড়ে উঠবে, তাও সকলে সুষমভাবে ভাগ করে নেবে। আমাদের সংবিধানে তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্র পরিচালনার একটা মূলনীতি বলে ঘোষিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মালিকানার নীতিতে বলা হয়েছে যে, প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা থাকবে। আর আইন যে সীমা নির্ধারণ করবে, সেই সীমার মধ্যে সমবায়গত বা ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে।' অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির চরিত্র হবে মালিকানা-সম্পর্কের দিক থেকে 'মিশ্র চরিত্রের', যদিও Mixed Economy শব্দটি সেদিন ব্যবহৃত হয়নি।

২. শুধু রাষ্ট্রীয় মালিকানা নয়, এই সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য মানুষকে শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়া এবং তাকে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ ও সুযোগের অধিকার দেওয়া : 'সর্বপ্রকার শোষণ থেকে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশকে মুক্তিদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ যাতে সকল নাগরিক লাভ করতে পারেন, সেই দায়িত্বও রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। সকল নাগরিক যাতে সমান সুযোগ পেতে পারেন এবং রাষ্ট্রের সর্বত্র যাতে সমান স্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ করা যায়, রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবেন।' অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে নাগরিকেরা দার্শনিক জন রাউলস (Rawls)-এর ভাষায় শুধু Formal Equality of Opportunity নয়, তারা Substantive Equality of Opportunity-এর অধিকারী হবেন। এর অর্থ, এটা শুধু যেনতেনভাবে পাওয়া মৌলিক সুযোগের সমতা বিধান নয়। এখানে গুণে-মানের সমতারও (Equality of Standards) কথাও থাকছে। দ্বিতীয়ত, এখানে শুধু Equality of Opportunity বা সুযোগের সমতার মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখা হয়নি। Equality of Outcomes-র কথাও অনুমিত থাকছে। সুযোগের সমতার পাশাপাশি, নাগরিকেরা যাতে করে সর্বত্র 'সমান স্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন' লাভ করেন, রাষ্ট্র তা 'নিশ্চিত করবে'–এটার ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

[বিস্তারিত, ঐ, ৩০.১০.২০২০]

বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র চান আবার সমাজতন্ত্র চান, এটি কী করে সম্ভব? বঙ্গবন্ধু ওই সাক্ষাৎকারে বলেন–'শোষক শ্রেণিকে দমন করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা দেশবাসীর আছে। সমাজতন্ত্র রাতারাতি হয় না– দীর্ঘদিনের ব্যাপার। শান্তিপূর্ণভাবে এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। রক্তপাত অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা দেশকে ঐক্য, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের

পথে এগিয়ে নিতে চাই। এ কাজে আমি মনে করি– শক্তির উৎস বন্দুকের নল নয়, শক্তির উৎস আমার জনগণ।

পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থায় ধ্বংস সাধনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। কাজেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলবার চেষ্টা করে। তাদের সঙ্গে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে যুক্ত হয় শোষকদের আন্তর্জাতিক দোসর–সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ। বাংলাদেশেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বৈরী ভূমিকায় আমরা ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করিনি। কারণ, জাতীয় স্বাধীনতা বিরোধিতা করাই তাদের বিঘোষিত নীতি। তবে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহেও প্রগতিশীল সংগঠন ও ব্যক্তি আছেন। তাঁরাও তাঁদের দেশে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করছেন। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা তাঁদের সক্রিয় সমর্থন লাভ করেছি। আশা করি, আমাদের সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও শান্তির সংগ্রামেও তাঁদের সক্রিয় সমর্থন আমরা লাভ করব।' [*ঐ*]

১৯৭৫ সালে শামসুজ্জামান খান ও কবীর চৌধুরীকে বলেছিলেন–'আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল দালাল ও রাজাকারদের ক্ষমা না করতে।... আমি তা করিনি। তাদের কুকীর্তির কথা জেনেও করিনি। আমার চোখেমুখে ভেসেছে অসংখ্য মা, বাবা, স্ত্রী ও শিশুর মুখ। আমার মনে হয়েছে আল্লাহর আরশ কাঁপবে না? আমি মানবিক হতে চেয়েছি। অনেকগুলো পরিবারকে ধ্বংস করিনি। আমি জাতির স্রষ্টা হয়ে সেটা করতে পারি না। আমি ভুল করেছি কি ঠিক করেছি ইতিহাস একদিন সে বিচার করবে। তবে খুনি ও প্রকৃত অপরাধীরা রেহাই পাবে না। তাদের বিচার করবো।' [বিস্তারিত, *আলাপ*]

সারা জীবন যা চেয়েছেন তার নির্যাস তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতা বাঙালি সম্পূর্ণ মেনে নেবে না। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই তিনি জাতীয়তাবাদের কথা ভেবেছেন। চীনে তিনি নারী-পুরুষ সমতা দেখেছেন, আমাদের সংবিধানেও তার নিশ্চয়তা আছে। ওই আমলের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই আধুনিক ছিল আমাদের সংবিধান। শুধু তা-ই নয়, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তিনি 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'– এই অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর পর লেনিন বা মাও সেতুং যেভাবে আদর্শ ও নীতির ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। লেনিন বা মাও সেতুং তাদের দর্শন প্রচার করেছেন, ক্যাডার সৃষ্টি করেছেন এবং জয়লাভের পর তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। তাদের ম্যান্ডেটও ছিল তা।

বঙ্গবন্ধুর ম্যান্ডেট ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আওয়ামী লীগে বহু ধরনের মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ যেমন ছিলেন, খোন্দকার মোশতাকও ছিলেন। সমাজতন্ত্রের কথা বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন ধরে বলেছেন, কিন্তু সে সম্পর্কে কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ লক্ষ্যে তিনি যখন জমির সিলিং ঘোষণা করেন এবং জাতীয়করণ করেন তা স্বার্থান্বেষী একটি মহল মেনে নেয়নি। মাও সেতুং বা লেনিন স্বাধীনতার পর শত্রুপক্ষকে যতটা পারেন নির্মূল করেছেন। বাংলাদেশের যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের ব্যাপারে তিনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কিন্তু ধনী, এলিট, আমলাতন্ত্র, বিভিন্ন চরম বামদল এবং নিজের দলের বিভক্তি– একসঙ্গে এত ফ্রন্ট সামাল দেওয়া ছিল মুশকিল। ছোটো দেশ, তার ওপর সব বিধ্বস্ত, খাদ্যাভাব, অর্থাভাব সব সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল। এসব সমস্যা সমাধানে তিনি আবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ফর্মুলা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। ডাক দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিপ্লবের, গঠন করেছিলেন বাকশাল এবং লক্ষ করুন এই নামে কৃষক ও শ্রমিকদের নামই রাখা হয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

তিনি বলেছিলেন–'চৌধুরী সাহেব, ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করলাম, কত জেল খাটলাম আর এখন এক পার্টি করতে যাচ্ছি। আগস্ট মাস থেকে বাকশালের কাজ পুরোপুরি শুরু হবে। আমি এটা চাইনি। বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। পাকিস্তানপন্থি, বিভিন্ন ইসলামি দল এবং অস্ত্রধারী জাসদের গণবাহিনী, সর্বহারা পার্টি প্রভৃতি প্রশাসন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ভেঙে ফেলার উপক্রম করে ফেলেছে। আমার বহু লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। ঈদের দিন নামাজের মধ্যে হত্যা করা হয় শুনেছেন কখনও? অতএব, অন্য কোনো পথ খোলা না দেখে আমি স্বাধীনতার পক্ষের লোকদের নিয়ে সমমনাদের একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে বাকশাল গঠন করছি। আমি সমাজতন্ত্রবিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষবিরোধী এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কোনো দল বা ব্যক্তিকে বাকশালে নেব না। আরও একটি কথা, আমার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য নয়, দেশকে বাঁচানোর জন্য এই পদক্ষেপ। আমি ক্ষমতা অনেক পেয়েছি, এমন আর কেউ পায় নাই। সে ক্ষমতা হলো জনগণের ভালোবাসা ও নজিরবিহীন সমর্থন। প্রফেসর সাহেব শোনেন, তুমিও লিখে রেখ, আমার এই একদলীয় ব্যবস্থা হবে সাময়িক। দেশটাকে প্রতিবিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করে আমি আবার গণতন্ত্রে ফিরে যাবো। বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাবো। তবে চেষ্টা করবো আমার গণতন্ত্র যেন শোষকের গণতন্ত্র না হয়। আমার দুঃখী মানুষ যেন গণতন্ত্রের স্বাদ পায়।' [*ঐ*]

৬

অনেকে বলেন, স্বাধীনতার পর যে সংবিধান রচিত হয় তা ভারত ও সোভিয়েতের চাপে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সমাজতন্ত্রের কথা, অসাম্প্রদায়িকতার কথা [ধর্মনিরপেক্ষতা] বঙ্গবন্ধু পঞ্চাশ দশক থেকেই বলেছিলেন। চীন তিনি দেখেছেন, চীন যেভাবে সমস্যাগুলোর সমাধান করেছে তা তিনি ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন। পরে সোভিয়েত ব্যবস্থাও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে সমস্যা সমাধানে। কিন্তু গণতন্ত্রের কথা তিনি ভোলেননি এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটি ছিল তাঁর কাছে অস্বস্তিকর, যা তিনি *নয়াচীনে* লিখেছিলেন। বাকশাল করার সময় তিনি বলেছিলেন, কম দুঃখে তিনি বাকশাল গঠন করেননি। কিন্তু অবস্থা ফিরলে তিনি আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যাবেন। সেদিন আর আসেনি। কিন্তু বাকশালের পর শৃঙ্খলা ফিরে আসছিল, উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মুজিব যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রয়াস চেয়েছিলেন তা মওদুদ আহমদও তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, 'আওয়ামী লীগ ছিল একটি দ্বন্দ্ববহুল বিশৃঙ্খল পেটি-বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংগঠন। অসংখ্য ধরনের শ্রেণি ও পেশার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দলটি একটি বহুমুখী শ্রেণিচরিত্রের ধ্বজাধারী হিসেবে বিকশিত হচ্ছিল। দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে চিন্তাগত অভিন্নতার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ফলে অসংখ্য ধরনের বিক্ষিপ্ত চিন্তা-চেতনাকে একসূত্রে গ্রথিত করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে তাদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই দলটির ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছিল।'

১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়া এসব মূলনীতি উৎপাটন করেন। কারণ, মানসিকভাবে তিনি পাকিস্তানের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলেন। আমাদেরও তার সহযাত্রী করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ঠিকই বুঝেছিলেন ধর্মের নামে আবারও রাজাকার-আলবদর পয়দা হবে। ১৯৭৫ সালের পর আমরা তাই দেখি। এ কারণে বোধ হয় বক্তৃতার শুরুতে বলেছিলেন– 'ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি।' তাঁর কথা সত্য হয়েছিল। লে. জেনারেল জিয়া পাকিস্তান যাত্রা শুরু করেছিলেন। তার অনুগামীদের পাকিস্তানে পৌঁছাবার আকুল বাসনা এখনও লক্ষ করি।

আগেই উল্লেখ করেছি, ১০ই জানুয়ারির বক্তৃতায় এক ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল। কী হবে? যে আশা তিনি দেখিয়েছিলেন তা পূরণ করতে না পারলে? তাই উদ্বেগ চাপা না রেখে বলেছিলেন– 'আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয় হারা, তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্যে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে–পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন অনেক কাজ করতে হবে।'

গণহত্যার কথা তিনি ভোলেননি, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার কারণে এর ব্যাপকতা হয়ত তখনও অনুধাবন করতে পারেননি। বলেছিলেন তিনি– 'যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের লোক মারা যায়নি। ... পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচারে গণহত্যা করেছে তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।'

জিয়াউর রহমান, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, মতিউর রহমান নিজামী ও বেগম খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ থেকে আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানে। কিন্তু বাঙালি যে পাকিস্তান যেতে চায় না তার প্রমাণ, বঙ্গবন্ধুকন্যাকে গত নির্বাচনে একতরফা ম্যান্ডেট দেওয়া। বঙ্গবন্ধুর করা সেই চার মূলনীতি, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে আমরা আবার বঙ্গবন্ধুর সেই বাংলাদেশে ফিরতে পারি। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার প্রথমে যা বলেছিলেন তা দিয়েই শেষ করব– 'বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শত্রু নেই।'

তিনি ফিরে এসেছেন তার একটি আলাদা গুরুত্ব ছিল ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশে ৩০ লক্ষের বেশি মানুষ শহিদ হয়েছিলেন। প্রতি পরিবারের ১০ জন করে সদস্য থাকলে ধরতে হবে তিন কোটি মানুষ বিষণ্ন ও বিপর্যস্ত ছিলেন। বাংলাদেশে পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ ধর্ষিত হয়েছিলেন। আগের হিসাবে ধরলে ৫০ লক্ষ পরিবার ছিল বিষণ্ন ও বিপর্যস্ত। ভারতে শরণার্থী হয়েছিলেন এক কোটি। তারা এসে পেয়েছিলেন শুধু ভিটে। বিপর্যস্ত ও বিষণ্ন ছিলেন তারা। এছাড়া আহত হয়েছিলেন, নির্যাতিত হয়েছিলেন অনেকে। এ হিসাব ধরলে দেখা যাবে অধিকাংশ মানুষই ছিলেন বিষণ্ন। তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন কিনা এ সন্দেহ আরও হতাশার সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে কিছুই ছিল না। দিন দিন কীভাবে সে চিন্তায়ও মানুষ ছিল বিপর্যস্ত ও বিষণ্ন। তাই একারণে তারা একজন ত্রাতার খোঁজে ছিল আর এ ত্রাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর ডাকে তারা যুদ্ধে গিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন। তাই সাগ্রহে তারা ত্রাতার অপেক্ষা করছিল। তিনি ফিরেছিলেন। এ ফিরে আসা মানুষকে সাহস জুগিয়েছিল, মানুষ ভেবেছিল তিনি তাদের এখন নিয়ে যাবেন সিরাজুল মোস্তাকিমে। মানুষ বিষণ্নতা কাটিয়ে, হতাশা ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলাদেশের তখন যে অবস্থা ছিল, বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কেউ বাংলাদেশে শাসন করতে পারতেন না। যারা ঐ সময়ের মানুষ বা রাজনৈতিক ইতিহাস পড়েছেন তারা বিষয়টি জানেন। বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন। তার ওপর ভিত্তি করে আজকের বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। একথা অস্বীকার সত্যের অপলাপ মাত্র।

প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন: প্রখ্যাত গবেষক, ইতিহাসবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক।

৪০১ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন

দেশের ৪৭০ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার। এর মধ্যে ৪০১ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রায় ৯৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া আরও ৩২ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ৯ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় আরও জানানো হয়েছে, ৬৪ জেলাতেই জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এজন্য সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা। এছাড়া ১৫৬টি স্থানে স্মৃতিসৌধ এবং ২০টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১১০টি স্থানে স্মৃতিসৌধ এবং ৪৩টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো জাতীয় চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যথাযথ মান এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। চলতি অর্থবছরে আরও সফলভাবে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রী প্রকল্প পরিচালকদের তাগিদ দেন। উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া আরও ৬টি নতুন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।

প্রতিবেদন: সুমন দেব

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

মো. রফিকুজ্জামান

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ইতোমধ্যে Industry 4.0 নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। আঠারো শতকের শেষার্ধে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়, সেটিই হচ্ছে শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড বিশ্বের প্রথম শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং দেশটির অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তাই কখনও কখনও ইংল্যান্ডকে 'পৃথিবীর কারখানা' বলা হয়ে থাকে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন একদল বিজ্ঞানী যারা জার্মান সরকারের জন্য একটি উচ্চ প্রযুক্তিগত কৌশল তৈরি করেছিলেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী চেয়ারম্যান অধ্যাপক ক্লাউস শোয়াব ২০১৫ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শব্দটিকে বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করেন। শোয়াব তখন এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং বায়োলজি (সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস)-কে একত্রিত করে পৃথিবীকে উন্নতির পথে আরও গতিশীল করা যায়। শোয়াব আশা করেন, এই যুগটি রোবোটিক্স বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো টেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বায়ো টেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের এবং সম্পূর্ণ স্বশাসিত যানবাহনের ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রযুক্তির যুগান্তকারী যুগ হিসেবে চিহ্নিত হবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ঐ প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যায়ে বর্তমানে অবশ্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে COVID-19 মহামারি-পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনের কৌশলগত টেকসই সমাধান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম শিল্পবিপ্লব

প্রথম শিল্পবিপ্লবের পূর্বে মানুষের জীবিকানির্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষিকাজ। জমির মালিকানা ছিল সামাজিক ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রধান উৎস। কিন্তু শিল্পবিপ্লব নতুন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করে। শিল্পের মালিক পুঁজিপতিরা সামন্ত প্রভুর স্থান দখল করে। ঠিক একইভাবে নগর জীবনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, গ্রামের গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে। উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে কাঠের পরিবর্তে কয়লা জনপ্রিয়তা লাভ করে। জ্বালানি ও প্রযুক্তির পরিবর্তনে শিল্পে যে নতুন দিগন্তের সূচনা হয় তাতে করে প্রথমবারের মতো প্রাকশিল্প যুগের সময়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থিতিশীল থাকা জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয়ে পরিবর্তন আসে। এই সময়ে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয় দুটোই বৃদ্ধি পায়। শুরু হয় প্রবৃদ্ধির হিসাবনিকাশ। প্রথম শিল্পবিপ্লবটি হয়েছিল ১৭৮৪ সালে বাষ্প এবং জলশক্তি ব্যবহার করে হস্তসাধিত শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়াকে মেশিন চালিত পদ্ধতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে। এরপর ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ ও ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের গতিকে বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সময়টি ইউরোপ এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে ১৭৬০ থেকে ১৮২০ বা ১৮৪০-এর মধ্যে। এর প্রভাব পড়েছিল বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প, কৃষি এবং খনি খনন কাজে, যদিও বস্ত্রশিল্পই সবচেয়ে দ্রুততার সাথে মানিয়ে নিয়েছিল। এর সামাজিক প্রভাব মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ক্রমেই শক্তিশালী করে তুলেছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ শিল্পেও এর প্রভাব ছিল।

দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব

মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সময় পর্যন্ত দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের সময়কাল। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের সময়কালে শিল্পায়ন হতে থাকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। বিশেষত গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপানকে কেন্দ্র করে শিল্পনির্ভর অর্থনীতি বিশ্বে তার শক্ত অবস্থান তৈরি করে। এই সময়ে তড়িৎ শক্তির আবিষ্কার ও তার ব্যবহার প্রথম শিল্পবিপ্লব থেকে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবকে আলাদা মহিমা দান করে। মানুষ কৃত্রিম আলোয় পৃথিবীকে আলোকিত করতে সমর্থ হয়। কারখানা থেকে শুরু করে বসতবাড়ি ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসতে শুরু করে, যা কর্মপরিবেশ ও জীবনমানে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। নগরগুলোতে শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ফলে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। সংক্রামক রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব কমতে থাকে, মৃত্যুহার হ্রাস পায়। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব বা প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সূচনা ঘটেছিল ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে। এর মূলে ছিল রেলপথ এবং টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিস্তার যা মানুষ, পণ্য এবং চিন্তাভাবনার দ্রুততর স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করেছিল। ক্রমবর্ধমান বৈদ্যুতিকরণ কারখানাগুলোকে আধুনিক প্রোডাকশন লাইন বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল। এটি ছিল উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি দুর্দান্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সময়। যার কারণে অনেক কারখানা শ্রমিকের চাকরি কৃত্রিম মেশিনগুলো দখল করে নেয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় শিল্পবিপ্লব

তৃতীয় শিল্পবিপ্লব মূলত কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব। মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে রোগ নির্ণয়– সর্বত্রই

কম্পিউটারের জয় জয়কার। মানুষ চন্দ্র বিজয় করতে যেমন সক্ষম হয়েছে তেমনি তৈরি করেছে কৃত্রিম উপগ্রহ, শব্দের চেয়ে দ্রুতগতির সুপারসনিক বিমান, দুর্বার গতির রেল, অভাবনীয় কার্যদক্ষতার সব কম্পিউটার। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে মানুষ গতি দিয়ে সময়কে জয় করেছে, ন্যানো সেকেন্ডের হিসাবও যেখানে গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে 'বিশ্বগ্রাম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে নয়া পর্যায়ে। একের পর এক গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্প শহর, শিল্প পার্ক। এই সময়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অতি নির্ভরশীলতা ও তার যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশ আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করেছে। ইন্টারনেটের ব্যবহার যোগাযোগ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাকেই আমূল বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্ব পরিমণ্ডলে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ গোটা বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের শেষে যখন শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি পূর্বের তুলনায় অনেকটা শিথিল, তখন তৃতীয় শিল্পবিপ্লব ওরফে ডিজিটাল বিপ্লব ঘটে। এক দশক পরে আসে জেড-১ কম্পিউটার, যা ফ্লোটিং-পয়েন্ট নাম্বার এবং বুলিয়ান লজিক ব্যবহার করে হিসাবনিকাশ করত। এটা ছিল আরও ডিজিটাল অগ্রগতির সূচনা। যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে সুপার কম্পিউটার। এই সময়ে উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কম্পিউটার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের কারণে যন্ত্রপাতি মানব শক্তির জায়গা দখল করতে শুরু করে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

বিগত সময়ের সমস্ত হিসাবনিকাশকে বাতিল করে আমাদের দরজায় এখন যে শিল্পবিপ্লবটি কড়া নাড়ছে সেটি হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, যার গতির দৌড় কল্পনার চেয়েও বেশি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবটির ভিত হচ্ছে জ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কম্পিউটিং প্রযুক্তি। রোবোটিক্স, আইওটি, ন্যানো প্রযুক্তি, ডেটা সাইন্স ইত্যাদি প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে নিয়ে যাচ্ছে অনন্য উচ্চতায়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে কর্মবাজারে। অটোমেশন প্রযুক্তির ফলে ক্রমশ শিল্পকারখানা হয়ে পড়বে যন্ত্রনির্ভর। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতোমধ্যে হাজার হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। বিগত বছরগুলোতে চীনের কারখানাগুলোতে রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। বাংলাদেশে বর্তমানে তরুণের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি, যা মোট জনসংখ্যার ৩০%-এর বেশি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছরজুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সব থেকে বড়ো হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্পবিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানাবিধ কর্মক্ষেত্র। নতুন যুগের এসব চাকরির জন্য প্রয়োজন উঁচু স্তরের কারিগরি দক্ষতা। ডেটা সাইন্টিস্ট, আইওটি এক্সপার্ট, রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারের মতো আগামী দিনের চাকরিগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী তরুণ জনগোষ্ঠী।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা অনুযায়ী, আগামী দুই দশকের মধ্যে মানবজাতির ৪৭% কাজ স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমনির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতানির্ভর চাকরি বিলুপ্ত হলেও উচ্চদক্ষতা নির্ভর যে নতুন কর্মবাজার সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করে তোলার এখনই সেরা সময়। দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা সম্ভব হলে জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যান্য অনেক দেশ থেকে অনেক বেশি উপযুক্ত। এক্ষেত্রে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে আজকের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপান পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক এবং সার্বিক জীবনমানের উত্তরণ ঘটানো যায়। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত নগণ্য এবং আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ মাত্র ১৫%। জাপান তার সব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেছে তার জনসংখ্যাকে সুদক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে। জাপানের এই উদাহরণ আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। বাংলাদেশের সুবিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলে আমাদের পক্ষেও উন্নত অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

শিক্ষা কার্যক্রম ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় শিক্ষাব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। প্রাথমিক পাঠ্যক্রম থেকেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সারা দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি অফিসের ফাইল-নথিপত্র ডিজিটাল ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করতে হবে। আর নতুন ডকুমেন্টও ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি করে সংরক্ষণ ও বিতরণ করতে হবে। এই বিষয়ে বর্তমানে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে, তবে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব এখনও অনেকটা অনুপস্থিত মনে হয়। কেবল পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের মানবসম্পদকেও যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হবে এই পরিবর্তনের জন্য। এসব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরবরাহ, চিকিৎসা, শিল্পকারখানা, ব্যাংকিং, কৃষি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করার পরিধি এখনও ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত। সত্যিকার অর্থে, যেহেতু তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সুফলই আমরা সবার কাছে পৌঁছাতে পারিনি, চতুর্থ বিপ্লব মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু তা আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। ব্যাপক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে তা করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র আমাদের দক্ষ জনগোষ্ঠী নেই বলে আমাদের পোশাকশিল্পের প্রযুক্তিগত খাতে কমবেশি তিন লাখ বিদেশি নাগরিক কাজ করে। অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় প্রায় এক কোটি শ্রমিক বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আমাদের দেশে যে রেমিটেন্স পাঠায় আমরা তার প্রায় অর্ধেকই তুলে দেই মাত্র তিন লাখ বিদেশিদের হাতে। তাই শুধু শিক্ষিত নয়, দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। শুধুমাত্র দেশেই নয়, যারা বিদেশে কাজ করছে তাদেরকেও যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে পাঠাতে হবে। বিদেশে আমাদের এক কোটি শ্রমিক আয় করেন ১৫ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ভারতের এক কোটি ৩০ লাখ শ্রমিক আয় করেন ৬৮ বিলিয়ন ডলার।

সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. রফিকুজ্জামান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

কর্মক্ষেত্রে আমাদের শ্রমিকদের অদক্ষতাই তাদের আয়ের ক্ষেত্রে এই বিরাট ব্যবধানের কারণ। সংগত কারণেই আমাদের উচিত কারিগরি দক্ষতার উপর আরও জোর দেওয়া। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনাটাও একান্ত জরুরি। আগামী দিনের সৃজনশীল, সুচিন্তার অধিকারী, সমস্যা সমাধানে পটু জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উপায় হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো, যাতে এ দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং কাজটি করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। একই ধরনের পরিবর্তন হতে হবে উচ্চশিক্ষার স্তরে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য Teaching and Learning Centre প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করার জন্য স্কিল বিষয়ে নিজেরা প্রশিক্ষিত হবেন। শিক্ষার্থীদের প্রচলিত প্রশ্নোত্তর থেকে বের করে এনে তাদের কেস স্টাডি, অ্যাসাইনমেন্ট, প্রজেক্ট ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষকগণকে মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রকাশ-যোগ্যতা, দলীয় কাজে দক্ষতা তৈরির জন্য ওই সব কেস স্টাডি, অ্যাসাইনমেন্ট কিংবা প্রজেক্টের উপস্থাপনাকে করতে হবে বাধ্যতামূলক এবং সেটি শুধু নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, ছড়িয়ে দিতে হবে নানা অঙ্গনে। উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরে শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনের কার্যক্রম সম্পর্কে হাতেকলমে শিখতে পারে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে মোকাবিলা করে এটিকে আশঙ্কার পরিবর্তে সম্ভাবনায় পরিণত করতে হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

দেশে প্রচলিত সবগুলো শিক্ষাব্যবস্থাগুলোকে একীভূত করে বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এক ধারায় নিয়ে আসতে হবে এবং সেই ধারায় বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষকমণ্ডলীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। চৌকশ প্রতিভাবান লোকজনকে শিক্ষকতায় আগ্রহী করার জন্য নানান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চশিক্ষা স্তরে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং যারা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও গবেষণায় নিয়োজিত আছেন তাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে। গবেষণা ক্ষেত্রে বাজেট বাড়াতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে গবেষণায় অর্থায়নে এগিয়ে আসতে হবে। প্রচুর বাংলাদেশি গবেষক বিদেশে বেশ ভালো ভালো গবেষণায় নিয়োজিত আছেন। প্রয়োজনবোধে তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে এদেশে এসে কাজ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও একাডেমিগুলো একত্রে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে হাতেকলমে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের উচিত হবে সকল বিভাগ/সেক্টর তাদের নিজস্ব কাজকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি/ভাবনাকে সামনে রেখে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। অতঃপর সকল সেক্টরের কর্মপরিকল্পনাকে সুসমন্বিত করে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সকলে মিলে একত্রে কাজ করতে হবে।

গণমাধ্যম ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

অধ্যাপক ক্লাউস শোয়াব ২০১৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন, আমরা চাই বা না চাই, এতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবনধারা, কাজকর্ম, চিন্তাচেতনা যেভাবে চলেছে, সেটা বদলে যেতে শুরু করেছে। এখন আমরা এক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ভিত্তির ওপর শুরু হওয়া ডিজিটাল এ বিপ্লবের ফলে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে গাণিতিক হারে, যা আগে কখনও হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি খাতে এ পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে। যার ফলে পালটে যাচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, এমনকি রাষ্ট্র চালানোর প্রক্রিয়া। প্রশ্ন উঠেছে– অনাগত সেই পরিবর্তন, গতি আর চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের অবস্থান কোথায়? সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের বেসরকারি রিসার্চ বিশ্ববিদ্যালয় জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিকে সঙ্গে করে বিশ্বের ১৩০টি দেশে ১২টি ভাষায় সমীক্ষা চালায় 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্টস' (আইসিএফজে)। সংস্থাটি তাদের সমীক্ষার নির্বাহী সারসংক্ষেপে উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব তুলে ধরে বলেছে, আমাদের সমীক্ষা একটি ক্রিটিক্যাল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছে। তা হচ্ছে, ডিজিটাল বিপ্লবের সঙ্গে গণমাধ্যম কী গতিশীল থাকতে

পারছে? এ অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সম্পাদক, ডিজিটাল কনটেন্ট উৎপাদক, অ্যানালাইটিক এডিটর গোত্রের মাত্র ১৮ শতাংশ গণমাধ্যমের নতুন ডিজিটাল সংশ্লিষ্টতায় (Role) অংশগ্রহণ করতে পারছে। গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্টদের অত্যাধুনিক ডিজিটাল দ্রব্যাদি ব্যবহার প্রবণতা, জ্ঞান ও এর সঙ্গে পরিচিতি খুবই কম। যারা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করেন তারা তা করেন কেবল প্রতিবেদনের ধারণা খুঁজতে। এক্ষেত্রে দৈন্য এমনই যে, মাত্র ১১ শতাংশ ভেরিফিকেশন টুলস ব্যবহার করে। এত সবের মধ্যে যারা ডিজিটাল সাংবাদিকতায় যুক্ত হয়েছেন তারা যথেষ্ট সুফল পাচ্ছেন। সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং হাইব্রিড গণমাধ্যম (যেসব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সনাতনী এবং ডিজিটাল মাধ্যমের সংমিশ্রণে পরিচালিত হচ্ছে) সনাতনী সাংবাদিকতাকে উতরে যাচ্ছে। আইসিএফজে বিশ্বকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করে সমীক্ষাটি চালায়। এরমধ্যে একমাত্র দক্ষিণ এশিয়ায় এখন উত্তরাধিকার বা সনাতনী গণমাধ্যম প্রভাব বিস্তার করে আছে। সেখানকার ৪৩ শতাংশ বার্তাকক্ষ এখনও সনাতনী ধাঁচের। ডিজিটাল বার্তাকক্ষের বেশির ভাগ কর্মীর বয়স ২৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে। হাইব্রিড ও সনাতনী গণমাধ্যমের কর্মীদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ৫২ শতাংশ সাংবাদিক ডিজিটাল সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ চাইলেও ৪০ শতাংশ গণমাধ্যম অবশ্য এটা ব্যবস্থা করেছে। ডিজিটাইজেশনের ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশাল পরিবর্তনের এই যে বাস্তবতা, এর শেষ কোথায়– তার পূর্বাভাস অসম্ভবই বটে। তবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সার্বিক রাজনীতি, জাতীয় নিরাপত্তাসহ মানুষের জীবনের এই বিপ্লব যে পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে, তা ভয়াবহ গতির পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে– এমন বলাটা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। এমন পরিস্থিতিতে মোটা দাগে আইসিএফজে গণমাধ্যম পরিস্থিতি চিহ্নিত করেছে তা উদ্বেগজনক বটে। সংস্থাটি নতুন বিপ্লবে গণমাধ্যমের অনুগামী হওয়ার উপযোগিতাকে এক শব্দে 'অনুপযুক্ত' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আগামী দিনের গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য যে তিনটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে, তার একটি বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকদিন ধরেই আছে। গণমাধ্যমের আয়-উৎসও আগে কমবেশি ছিল। এসব নিয়েই গণমাধ্যম এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু চতুর্থ শিল্পবিপ্লব যে টেকনোলজিক্যাল অভিযোজনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে তা আয়ত্তের বিকল্প কোথায়? এগুলো ভেবে দেখার এখনই প্রকৃত সময়।

মূল কথা হচ্ছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে যেমন প্রয়োজন নতুন নতুন টেকনোলজি, ঠিক তেমনি প্রয়োজন গণমানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া কার্যকরভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। দেশের প্রচলিত ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াসহ কমিউনিটি বেতারগুলোকে একসাথে এর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঠিক বাস্তবায়নের দিকে আমাদের সবাইকে এগোতে হবে।

আশার কথা, বর্তমান সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাস্তবায়নে সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ই ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিসিআই) অনুষ্ঠিত 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলুশন অ্যান্ড বিয়ন্ড' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি হিসেবের ওপর তিনটি বিষয়ে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। এগুলো হলো– অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী তৈরি করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক হারে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ। তাই সবাই মিলে আমাদের এখন থেকেই একটি সুপরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব, গড়তে পারব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট লিংক

মো. রফিকুজ্জামান: সাবেক অতিরিক্ত সচিব, rafiq021259@gmail.com

প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন-চ্যানেল আই প্রকৃতি সংরক্ষণ পদক ২০২০

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, বিজয়ের ৫০ বছর পেরোনোর এই শুভলগ্নে সবাইকে শপথ করতে হবে দেশকে ভালোবাসার, এগিয়ে আসতে হবে প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায়। প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে কার্যক্রম শুরু করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। ১৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় চ্যানেল আই চত্বরে 'প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন-চ্যানেল আই প্রকৃতি সংরক্ষণ পদক ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শাহাব উদ্দিন বলেন, ক্ষুদ্রপ্রাণী থেকে শুরু করে আমাদের মতো মানুষ, প্রকৃতিতে প্রত্যেকেরই আছে যার যার ভূমিকা। আমাদের সেগুলো জানতে হবে। সবাইকে জানাতে হবে। তবেই আমরা বাংলাদেশকে দেখতে পাবো সুখী, সুন্দর এবং সোনার বাংলাদেশ হিসেবে। তিনি বলেন, এবারের 'প্রকৃতি সংরক্ষণ পদক' পেলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মনোয়ার হোসেন। তিনি তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ছোট্ট একটি প্রজাপতি প্রকৃতিতে কত বড়ো ভূমিকা রাখে। শুধু প্রজাপতি নয়, মৌমাছি বা ফড়িংয়ের মতো বিভিন্ন কীটপতঙ্গ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অনেক অবদান রাখছে।

প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী, মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামাল, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আশরাফ উদ্দিন এবং প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরী।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

প্রফেসর ড. মো. এমরান জাহান

১০ই জানুয়ারি পালিত হয় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৫০তম (১৯৭২-২০২২) বার্ষিকী, সুবর্ণ জয়ন্তী। একইসঙ্গে বাঙালি জাতি সমারোহে পালন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। জাতীয় জীবনে এই তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা খুবই তাৎপর্যবহ। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে বন্দি ছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিহাসের নাটকীয়তায় ভরপুর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্বটি। পাকিস্তান কারাগারে কী ঘটেছিল, মুক্তির প্রাক্কালে পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জেড এ ভুট্টোর সঙ্গে কী দরকষাকষি চলছিল, কীভাবে নেতা লন্ডনে পৌঁছলেন, তারপর দিল্লি হয়ে বাংলার মাটিতে পা রাখলেন– এসব বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুব বেশি পাওয়া যায় না। নানান স্মৃতিকথা, তৎকালীন বিদেশি পত্রপত্রিকা এবং বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণ ও সাক্ষাৎকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা। হালে রাজা আনার খান নামে পাকিস্তানি এক গোয়েন্দার কিছু জবানবন্দি প্রকাশ হয়েছে, যিনি ছদ্মবেশে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সহবন্দি হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার মন্ত্রে প্রস্তুত জাতি: গ্রেপ্তারের পূর্বাভাস

১৯৭০ সালের নির্বাচন। পাকিস্তানি জান্তা সরকারের সকল গোপন পরিকল্পনা ব্যর্থ। তাদের অবাক করে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ লাভ করে নিরঙ্কুশ বিজয়। এবার নতুন প্রহসন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা যুক্ত হলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে। সময় দ্রুত বয়ে যায়। ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে ঢাকার ৩রা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের লিবারেল রাজনীতিক মোহাম্মদ আজগর খান সাক্ষাৎ করেন শেখ মুজিবের সঙ্গে। মোহাম্মদ আজগর খান জানতে চান, পরিস্থিতি কী হতে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু জানান, খুবই সহজ। প্রেসিডেন্ট ঢাকায় আসবে। ভুট্টো তাকে অনুসরণ করবে। ইয়াহিয়া অচলাবস্থা সৃষ্টি করবে। সামরিক অভিযানের আদেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করবে। অতঃপর পাকিস্তান শেষ। ঘটনা আসলে তা-ই ঘটল। এ বিবরণ জানা যায় মোহাম্মদ আজগর খানের *Generals in Politics: Pakistan 1958-1982* গ্রন্থে।

দাম্ভিক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ ঢাকায় এলেন। ১৬ই মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া একান্ত আলোচনা শুরু। কিন্তু ভেতরে ভেতরে গভীর পরিকল্পনা। সামরিক প্রস্তুতি। ঢাকায় মেজর সিদ্দিক সালিক জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে খুব কাছ থেকে এই সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। পাকিস্তানি এই কর্মকর্তার *Witness to Surrender* গ্রন্থে দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় এই সময়ের গোপন ঘটনাবলি। ইয়াহিয়া- ভুট্টো গোপনে সামরিক নিধনযজ্ঞে একমত হলেন। ২৫ তারিখ সন্ধ্যে হতে না হতেই গোপনে 'পাকিস্তানি অতিথিগণ' ঢাকা ত্যাগ করতে লাগলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সংলাপ অসমাপ্ত রেখেই ঢাকা থেকে পাড়ি জমান রাওয়ালপিন্ডি। পেছনে রেখে গেলেন বাঙালি নিধন পরিকল্পনা 'অপারেশন সার্চলাইট'।

মহানায়ক মুজিব গ্রেপ্তার

এদিকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে অন্য দৃশ্য। ২৫শে মার্চের সন্ধ্যা এবং রাত অবধি চিন্তাগ্রস্ত জনতা। এই সময়ে ৩২ নম্বরে কী ঘটেছিল সেই সন্ধ্যালিপি পাওয়া যায় ড. ওয়াজেদ মিয়ার বিবরণীতে। পুরো সময়টি তিনি ঐ বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই ছিলেন। নেতা সবাইকে নির্দেশ দিলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে। একে একে সবাই বিদায় নিলেন। ওয়াজেদ মিয়া লিখেন, 'নিজে সিদ্ধান্ত নিলেন ভিন্ন। পালাবেন না। জীবনে পালানোর অভ্যাস নেই। নিজের পরিণতি মেনে নিলেন। গভীর রাতে ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ততক্ষণে ২৬শে মার্চ। নেতার বাড়ি ঘিরে রেখেছে হিংস্র লে. ক. জেড এ খান এবং মেজর বেলাল। তার আগেই রাত ১২টায় ড. ওয়াজেদ মিয়া এবং শেখ হাসিনা ৩২ নম্বর ত্যাগ করেন। উঠেন ধানমন্ডির ১৫ নম্বরের ভাড়া করা বাসায়। রাত দেড়টা। তারপরের পরিস্থিতি জানা যায় বঙ্গবন্ধুর জবানি থেকেই। টিভি সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু সেদিনের রাতের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'বিদায় নিলাম স্ত্রীর কাছ থেকে।... তিনি একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। আমি তাঁকে চুমু দিলাম। বিদায়ী চুম্বন। তারপর আমি বের হয়ে আসি।' ওয়ারলেস মেসেজে আর্মি হেডকোয়ার্টারকে জানানো হলো, 'BIG BIRD IN THE CAGE.'

বাঙালির প্রিয় নেতা কোথায় আছেন, কীভাবে আছেন– তা কিছুই জানে না বাঙালি জাতি। একমাস পর ২৬শে এপ্রিল শুধু একটি ছবি ছাপা হয় আমেরিকার *নিউজউইক* পত্রিকায়। করাচি বিমানবন্দরের লাউঞ্জে দুজন নিরাপত্তা প্রহরী সমেত নেতার ছবি। পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে শেখ মুজিব পাকিস্তানে বন্দি। মুজিবের প্রিয় সবুজ-শ্যামল সোনার বাংলা ছেড়ে পাকিস্তানের লায়ালপুরের এক নির্জন নিঃসঙ্গ সেলে বন্দি। পদ্মা-যমুনার সবুজ প্রান্তর থেকে দুহাজার কিলোমিটার দূরে পাঞ্জাবের ফয়সালাবাদের এই নির্জন কারাগার। ৯ই আগস্ট ১৯৭১। সরকারি প্রেসনোট জারি হয়। প্রেসনোটে বলা হয়, ১১ই আগস্ট থেকে শেখ মুজিবের বিচার হবে বিশেষ সামরিক আদালতে। বিচারকার্য গোপন থাকবে। ২৬ তারিখ বেতার ভাষণেই ইয়াহিয়ার দম্ভোক্তি ছিল, 'This time Sheikh Mujib shall not go unpunished'.

ফয়সালাবাদের লায়ালপুর কারাগার। নিঃসঙ্গ বন্দি শেখ মুজিব। কারাগারের ভেতরেই সামরিক আদালতে বিচারকার্য চলে। ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর কারাগারে রাখা হয়। বিচার কাজ শেষ হলে ৪ঠা ডিসেম্বর মিয়ানওয়ালি কারাগারে প্রেরণ করা হয়। আসামি শেখ মুজিবের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এ কে ব্রোহিকে। সামরিক আদালত বাঙালির নেতাকে দোষী সাব্যস্ত করে। শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ– 'শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।'

এদিকে বাংলাদেশে ভিন্ন এক দৃশ্যপট। ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকেই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মোড় ঘুরতে থাকে। ১৫ই ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চলের পাকিস্তানি সমরনায়ক জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজির সকল দাম্ভিকতা শেষ। যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয়

লাভ করে। নিয়াজিসহ ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈনিক যৌথ বাহিনীর নিকট বন্দি হয়ে পড়ে। পাকিস্তানেও ইয়াহিয়ার পতন ঘটে। ক্ষমতার মঞ্চে আসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। বন্দি শেখ মুজিবের জীবন নিয়ে চলে নানান নাটকীয়তা। ভুট্টো ক্ষমতা নেওয়ার আগ মুহূর্তে ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করেন শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার জন্যে। কারণ এতে বাংলাদেশে আটকা পড়া ৯৩ হাজার সৈন্যকে পাকিস্তানে ফেরত আনা কঠিন হয়ে পড়বে। আর বাঙালিদের কাছে জীবিত শেখ মুজিবের চেয়ে মৃত শেখ মুজিব শহিদের মর্যাদা পাবে।

মুক্তির নাটকীয়তায় ভরপুর কয়েকটি দিনঃ ভুট্টোর শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি

ইয়াহিয়ার খাঁচায় বন্দি শেখ মুজিব নয় মাসে জানতে পারেননি তাঁর রেখে যাওয়া সোনার বাংলায় কী ঘটছে। পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে এক বিষাদময় সময়ে ২১শে ডিসেম্বর (১৯৭১) জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে নতুন সরকার গঠন করেন। আর এদিকে বিজয়ের মহা-আনন্দে ভাসছে ঢাকা নগরী। এর পরের দিন ২২শে ডিসেম্বর মুজিবনগর প্রবাসী সরকারও ঢাকার পথে যাত্রা করে। ইয়াহিয়া সরকারের বাঙালি প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন গ্রহণ করেন ভুট্টোর ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব। নূরুল আমীনকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বহির্বিশ্বে জানানো হয় পূর্ব বাংলা পাকিস্তানেরই একটি অংশ। ইয়াহিয়ার পতনের পরও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অন্ধকারে রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটেছে তা অন্ধকারে রেখে শেখ মুজিবকে বিভ্রান্ত করার কৌশল নেয় নতুন প্রেসিডেন্ট সুচতুর ভুট্টো। এবার মুজিব হলেন ভুট্টোর বন্দি। শুরু হলো বন্দির সঙ্গে দরকষাকষি। ২৬ তারিখ শেখ মুজিবকে মিয়ানওয়ালি জেল থেকে মুক্তি দিয়ে রাওয়ালপিন্ডি আনা হয়। সেখানকার সিহালা অতিথি ভবনে নেতা নজরবন্দি। এবার নেতা বুঝতে পারেন, নয় মাসে বাংলাদেশে বড়ো ধরনের কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭১। নজরবন্দি শেখ মুজিবকে জানানো হয়, একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। বঙ্গবন্ধু আগন্তুকের মুখোমুখি হয়ে অবাক। নেতার সামনে সরাসরি ভুট্টো বসে আছেন। ভুট্টো জানালেন,'শেখ সাহেব, আমি এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।' শেখ মুজিব জানতে চাইলেন, 'আমি নতুন প্রেসিডেন্টের বন্দি, নাকি মুক্ত।' ভুট্টো অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে বললেন, 'শেখ সাহেব, আপনি যখন খুশি চলে যেতে পারেন।' তারপর ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা কী ছিল তা বঙ্গবন্ধুকে অবগত করালেন ভুট্টো। বঙ্গবন্ধু এবার ধারণা করলেন তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শর্তসাপেক্ষ। ঐদিন প্রাথমিক আলোচনা শেষে উৎসুক সাংবাদিকরা আলোচনার অগ্রগতি জানতে চাইলে ভুট্টো কূটনৈতিক ভাষায় বলেন, 'শেখ সাহেব আমার মুখে কষাঘাত করেননি, আমিও আমার আগ্নেয়াস্ত্রটি বের করার প্রয়োজনবোধ করিনি।' শেখ মুজিবের সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনা হবে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।

ভুট্টো শেখ মুজিবের নিকট থেকে, পাকিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক একটি চুক্তি আদায় করতে চেয়েছিলেন, যাতে শেষ রক্ষা হিসেবে পাকিস্তান নামটি সেখানে থাকে। ভুট্টো আরও বলেন যে, প্রয়োজনবোধে আমরা ইরানে কিংবা সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অধিক আলোচনায় বসতে পারি। ২৮শে ডিসেম্বর *ফাইনান্সিয়াল টাইমস*-এর রাওয়ালপিন্ডির সংবাদদাতা কেভিন র‍্যাফার্টি প্রেরিত সংবাদে বলা হয়, 'দূরদর্শী বাঙালি নেতা ভুট্টোকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমার জনগণের সঙ্গে কথা না বলে আমার পক্ষে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া সম্ভব নয়। আগে আমাকে যেতে দিন, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব।' এই আশাহত অবস্থায় ভুট্টো-মুজিব আলোচনা সমাপ্ত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭১। সিহালা অতিথি ভবনে নজরবন্দি বঙ্গবন্ধু পায়চারি করছেন। হঠাৎ সেখানে হাজির করা হয় বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ড. কামাল হোসেনকে। কেউ ভাবতেই পারেননি, এভাবে এখানে তাঁদের দেখা হবে। আবেগে আপ্লুত উভয়েই। ড. কামাল হোসেনকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল অ্যাবোটাবাদে হরিপুর জেলখানায়। সেখান থেকে তাঁকে ভুট্টোর আদেশে সিহালা অতিথি ভবনে আনা হয়। ড. কামাল হোসেন দেখলেন, লুঙ্গি আর লালচে ড্রেসিং গাউন পরা বঙ্গবন্ধু। আর হাতে সার্বক্ষণিকের সাথি সেই প্রিয় উইলসন তামাক পাইপটি। একমাত্র বিদেশি জিনিস যা তিনি নিত্য ব্যবহার করেন। তারপর কথার শেষ নেই। নয় মাস পর বাঙালি দুই নেতা মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাদ গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসটি বঙ্গবন্ধুর জীবনে নানা নাটকীয়তায় পার হলো। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। নতুন আলো হয়ে দেখা দিলো ১৯৭২ সাল। ৩রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী করাচির নিসতার পার্কে এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, 'আওয়ামী লীগ নেতাকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হবে।' গোটা বিশ্বে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, শীঘ্রই বাঙালি নেতাকে তাঁর স্বদেশে যাবার উদ্দেশ্যে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভুট্টো হাল ছাড়ার পাত্র নন। তিনি শেষ চেষ্টা চালিয়ে যান। বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে শেখ মুজিব ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই সুযোগে দুই দেশের মধ্যে কনফেডারেশন বা যুক্ত পাকিস্তানের লক্ষ্যে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লিখিত দলিল আদায়ের সর্বশেষ চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োজনবোধে শত্রু ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মেহমান হয়ে ঢাকায় আসতেও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মি. ভুট্টোর কী সংলাপ হয়েছিল তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় ব্রিটিশ লেখক রবার্ট পেইনের বিবরণীতে (রবার্ট পেইন, *The Tortured and the Damned,* London, Part, 1v, p. 146)।

অবশেষে মহানায়কের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

চিড়িয়া উড় গায়াঃ ভুট্টো

অবশেষে ঘনিয়ে এলো বহু প্রতীক্ষিত মুক্তির দিন। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর 'খাঁচার বড়ো পাখি' উড়াল দিলো তাঁর প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশে। কারও উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। ইয়াহিয়া পারলেন না শেখকে ফাঁসিতে ঝুলাতে, আর ভুট্টো ব্যর্থ হলেন নেতাকে অন্ধকারে রেখে অখণ্ড পাকিস্তান চুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করাতে। ৮ তারিখের মধ্যরাত। পিআইএ-এর বিমান তৈরি। বিমান পরিচালনার দায়িত্বে আছেন পাকিস্তানি বৈমানিক এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী। উড়োজাহাজ উড়াল দিবে লন্ডনের উদ্দেশে। সমস্ত বিষয় গোপন রাখা হলো। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সঙ্গীকে বিমানের কাছে নিয়ে যান স্বয়ং পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি তখনও আশা করে আছেন তার বিশেষ মেহমান দেশে গিয়ে ভুট্টোর প্রস্তাবিত কনফেডারেশন বা অখণ্ড পাকিস্তানের কথা বিবেচনা করবেন। গভীর রাতে পিআইএ-এর উড়োজাহাজটি উড়াল দিয়ে পাকিস্তান আকাশ সীমা ত্যাগ করে, তখন ভুট্টো সেদিকে তাকিয়ে আক্ষেপে বললেন, 'চিড়িয়া উড় গায়া'। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের বিনির্মাণ, আরেক বাঁক, আরেক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম। ইতিহাসের চরম বাস্তবতা।

লন্ডনের মানুষ ঘুম থেকে উঠার আগেই প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী জাফর চৌধুরীর বিমানটি হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ওই সময়ের ঘটনাবলির বর্ণনা পাওয়া যায় জাফর চৌধুরীরই এক লেখায়। (এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী, *Mosaic of Memory*, Lahore, p. 74-75). জাফর চৌধুরীর বর্ণনায় আছে, লন্ডনের সময় সকাল ছ'টায় লন্ডনে বিমানটি অবতরণ করে। সঙ্গে সঙ্গেই বিমানবন্দরের কিছু কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুকে ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে যায়। সঙ্গে বৈমানিক জাফরও ছিলেন। তিনি লিখেন, "সেখানে শেখ মুজিব জানতে চাইলেন তাঁর কিছু বন্ধুকে ফোন করার ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি কি না। তাঁর বন্ধু সবাই ছিলেন বাঙালি রেস্টুরেন্টের মালিক। এত সকালে এদের কাউকে পাওয়া গেল না। তারপর তিনি মাহমুদ হারুনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। তিনি ফোন ধরলেন এবং কথা বললেন। এরই মধ্যে বৈদেশিক দপ্তরের কিছু কর্মকর্তা এসে হাজির হলেন। তারা কিছুদিন পূর্বে পাকিস্তান হাইকমিশনের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর শেখ মুজিব আমাকে বললেন, 'এয়ার মার্শাল, আপনি আমার জন্য যা করেছেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ'।"

লন্ডনের ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ (জানুয়ারি ১৯৭২)

আসলে সেদিন ছিল রোববার। লন্ডনে সাপ্তাহিক হলিডে। সেখানে উপস্থিত বাঙালি কর্মকর্তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন রেজাউল করিম। তিনি বাংলাদেশ কনস্যুলেটের উপপ্রধান। তিনি সৌভাগ্যবান বাঙালি কর্মকর্তা যিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান। আরও ছিলেন আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা শেখ আবদুল মান্নান, গাউস খান। এর পূর্বে ৫.২০ মিনিটে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ এশিয়া ডেস্কে একটি খবর আসে। বলা হয় পিআইএ-এর একটি অনির্ধারিত এয়ার ক্রাফট এক ঘণ্টার মধ্যে হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। এই বিমানে শেখ মুজিবকে বহন করে আনা হচ্ছে। খবরটি গ্রহণ করেন কর্মকর্তা ইয়ান নর্দানল্যান্ড। তিনি হতভম্ব, সময় অল্প, আবার ছুটির দিনের সকাল। তিনি বঙ্গবন্ধুর আগমনের খবর সে সময়ে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ মিশনকে অবহিত করেন। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরী ৬ই জানুয়ারি বাংলাদেশের উদ্দেশে লন্ডন ত্যাগ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর সম্মানিত অতিথির জন্য বিখ্যাত ক্ল্যারিজেস হোটেল প্রস্তুত করে রাখে। ব্রিটিশ সরকারের নির্ধারিত লিমুজিন গাড়িতে না চড়ে রেজাউল করিমের ছোটো গাড়িতে করে নেতা সেই হোটেলে পৌঁছেন। বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী ড. কামাল হোসেন এবং তাঁর পরিবার লিমুজিনে চড়েন। পরবর্তীকালে ১৬.০১.১৯৯৭ তারিখে *ডেইলি স্টার* পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে রেজাউল করিম জানান, বঙ্গবন্ধু তাঁর গাড়িতে উঠে বার বার জানতে চান, 'সত্যিই আমরা স্বাধীন হয়েছি!'

লন্ডনে প্রিয় নেতার অবস্থান ছিল মাত্র একদিন। ইতোমধ্যেই বিবিসি ৯ই জানুয়ারির সকাল ৭টার সংবাদে বঙ্গবন্ধুর লন্ডন আগমনের সংবাদটি বিশেষভাবে প্রচার করে দেয়। সেখানকার পত্রপত্রিকা ও বিবিসি রেডিও ব্যাপক কাভার দেয় শেখ মুজিবের মুক্তি ও লন্ডন অবতরণের বিষয়ে। ৯ই জানুয়ারি সেখানকার *দ্য সানডে টাইমস* প্রথম পৃষ্ঠার ৫ কলামব্যাপী প্রচ্ছদ করে। শিরোনাম দেওয়া হয়, *Sheikh Mujib in London: Sunday Times exclusive How Bangladesh Leader escaped last minute execution. Dawan Landing drama.*

আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদের প্রিয় নেতাকে দেখতে হোটেলে ভিড় জমান। ওই সময়ের ঘটনাবলির বর্ণনা দেন তাঁর সঙ্গী ড. কামাল হোসেন। তাঁর *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* ১৯৬৬-১৯৭১ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু হোটেল থেকে ঢাকায় পরিবারের সঙ্গে এই প্রথম যোগাযোগ করেন। কথা বলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামালের সঙ্গে। তিনি ফোনে কথা বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ লন্ডনের বাইরে ছিলেন। তিনি অন্য কর্মসূচি বাতিল করে দ্রুত লন্ডনে ফিরে আসেন এবং শেখ মুজিবকে ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে সংগ্রামী বাঙালি নেতা সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ লেবার পার্টির বিরোধীদলীয় নেতা হ্যারল্ড উইলসন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হোটেল ক্ল্যারিজেস-এ দেখা করেন এবং শুরুতেই 'গুড মর্নিং, মি. প্রেসিডেন্ট বলে' অভিবাদন জানান। এরই মধ্যে লন্ডনের বিখ্যাত সাংবাদিকরা ভিড় করে আছেন বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে।

এবার প্রিয় নগরী ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা। ৯ই জানুয়ারি ১৯৭১। বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছে দুটি বিমান। একটি ভারত থেকে প্রেরিত, অপরটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া শুভেচ্ছা স্বরূপ রাজকীয় কমেট বিমান। মহান নেতা চড়ে বসলেন ব্রিটিশ বিশেষ

বিমানেই। হিথ্রো বিমানবন্দরে নতুন জন্ম নেওয়া জাতি রাষ্ট্রের স্থপতিকে আবেগ আর আনন্দ-কান্নায় বিদায় দিলেন প্রবাসী বাঙালি নেতৃবৃন্দ। ইতিহাসের এক সাক্ষী হয়ে থাকলেন তারাও।

যাত্রাপথে ইউরোপের দ্বীপ রাষ্ট্র সাইপ্রাস বিমানবন্দরে অবতরণ। উদ্দেশ্য বিমানের জ্বালানি সংগ্রহ করা। স্বল্প যাত্রাবিরতির সুযোগটি হাতছাড়া করেননি দ্বীপটির রাষ্ট্রপতি ম্যাকারিয়াস। তিনি বাঙালি নেতাকে অতি সম্মানের সাথে স্বাগত জানান। রাতের আঁধার পার হয়ে ভারতবর্ষের আকাশে রাজকীয় বিমানটি প্রবেশ করে। ততক্ষণে ১০ই জানুয়ারির সকাল। ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানটি দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে। ক্ষণিকের যাত্রাবিরতি। আরেক উষ্ণ অভ্যর্থনা। বিমানের দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বল ও ক্লান্ত দেহে কিন্তু বজ্রকণ্ঠে দুটি শব্দ 'জয় বাংলা'। উপস্থিত রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর মন্ত্রিবর্গ। রাস্তার চতুর্পাশে হাজার জনতার ভিড়। পালাম বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত লিখিত একটি ভাষণ প্রদান করেন নেতা। ভাষণে বাঙালি নেতা, নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'এক জীবনব্যাপী বন্দিত্ব থেকে আমি ফিরে যাচ্ছি মুক্ত, স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশে।... সামনে যে পথ আমরা রচনা করব তা হবে শান্তির ও প্রগতির পথ। কারও প্রতি ঘৃণা বুকে নিয়ে আমি দেশে ফিরছি না। মিথ্যার ওপর সত্যের জয়, অশুচিতার ওপরে শুচিতার জয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয় এবং সর্বোপরি অশুভ ও অসত্যের উপরে সার্বজনীন সত্যের বিজয়ের প্রেক্ষাপটেই আমি ফিরে যাচ্ছি আমার নিজের দেশে। রক্তস্নাত ও শুচিতায় উদ্ভাসিত স্বাধীন বাংলাদেশে।' এবার কৃতজ্ঞতার পালা। ভারত সরকার এবং জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'ভারত হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।'

মহানায়কের নিজ স্বাধীনভূমে ফিরে আসার বিলম্ব আর কারও তর সইছে না। হিথ্রো থেকে পালাম হয়ে এবার রুপালি কমেট ব্রিটিশ বিশেষ বিমানটি ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা। স্বল্প আকাশপথ। এবার বিমানের যাত্রী বৃদ্ধি পেল। দিল্লি থেকে সঙ্গী হলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, সাংবাদিক আতাউস সামাদ, তরুণ কূটনীতিক ফারুক আহমদ চৌধুরী। আর পাকিস্তান থেকেই সপরিবার সঙ্গী ছিলেন ড. কামাল হোসেন। দিল্লিতে যাত্রাবিরতি এবং ঢাকায় আগমনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো চমৎকার করে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন বিমানের সহযাত্রী সে দিনের তরুণ কূটনীতিক ফারুক চৌধুরী তাঁর *দেশ দেশান্তর* গ্রন্থে ।

তেজগাঁও থেকে রেসকোর্স

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের রাজধানী ঢাকা। আবেগ-আনন্দ অপরদিকে আপনজনের হারানো বেদনায় ভারাক্রান্ত ঢাকার জনতা। নেতা আসবে, আসবে স্বাধীন বাংলাদেশের মহানায়ক। পালাম থেকে অল্প সময়েই রাজকীয় বিমানটি নীল আকাশের সাদা মেঘ ভেদ করে তেজগাঁও বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করল। পৌষের দুপুর। ঢাকার সময় বেলা তখন তিনটা বাজে বাজে। পৌষের মিষ্টি রোদেলা দুপুরে নেতা নামলেন। নয় মাস পূর্বে বন্দি হয়ে রাতের আঁধারে এই মাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ ফিরলেন বিজয়ী বীরের মতো। একেই বলে ইতিহাসের পুনর্জন্ম। লাখো বাঙালি আনন্দ-উল্লাস করছে। জয় বাংলা ধ্বনিতে প্রকম্পিত ঢাকা। একুশবার তোপধ্বনি দিয়ে নেতাকে বরণ করা হলো। উপস্থিত মুজিবনগর সরকারের সদস্যবৃন্দ। বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেন বৃদ্ধ পিতা শেখ লুৎফর রহমান। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে খোলা গাড়ি চলল সেই ঘোড়দৌড় ময়দানে (রেসকোর্স ময়দান), যেখানে ১০ মাস পূর্বে ৭ই মার্চ ঘোষণা করেছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ স্থানেই পাকিস্তানি বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। ইতিহাসের কী চমৎকার প্রতিশোধ, কী ট্র্যাজেডি । আবার সেই মঞ্চ। নেতা উঠলেন। দুপুর পেরিয়ে শীতের বিকাল ৪.৩৪ মিনিট।

এবার গর্জন নেই, ক্ষোভ নেই। আছে আবেগ, আনন্দ আর উচ্ছ্বাস। নতুন দেশ গঠনের ভাবনা, দিক নির্দেশনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান। বললেন, 'গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন;... আজ আবার বলছি আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন।' নেতা সকল মুক্তিযোদ্ধাকে অভিবাদন জানান। স্বাধীনতা পক্ষের সকল রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানান।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে।'

এবার প্রিয় নেতার ঘরে ফেরার পালা। বিগত ১০ মাস তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা নেই, সাক্ষাৎ নেই। অপেক্ষায় বৃদ্ধ মা বেগম সায়েরা খাতুন, অপেক্ষায় জীবনসঙ্গী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং পুত্র-কন্যা। তবে এবার ধানমন্ডির প্রিয় ৩২ নম্বরের সড়কের বাড়িতে নয়, উঠলেন ১৮ নম্বরের বাড়িতে। এখানেই অবস্থান করছেন নেতার প্রিয় পরিবার। এই বাড়িটিতে বিগত নয় মাস পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গৃহবন্দি ছিলেন পরিবারের সবাই। দুপুর-বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পৌনে ছ'টা। বাসায় সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। আনন্দে অপেক্ষা করছে শিশুপুত্র শেখ রাসেল, কাঁদছেন বেগম ফজিলাতুন নেছা। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাবাহী সাদা ক্যাডিলাক গাড়িটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। আবেগ, কষ্ট আবার মহামিলনের আনন্দ নিয়ে মিলিত হলেন পরিবার, স্বজনদের সঙ্গে শেখ মুজিব। সমাপ্ত ঘটল প্রাণের নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নাটকের শেষ দৃশ্য। পেছনে পড়ে থাকল বাঙালির এক গৌরবময় ইতিহাস, ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার ইতিহাস।

প্রফেসর ড. মো. এমরান জাহান: প্রবন্ধকার ও অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

সততা আর নৈতিকতা শুদ্ধাচারের মূল কথা

দশই জানুয়ারি

জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

দশই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি তিনি পাকিস্তানের জিন্দানখানা থেকে মুক্তি পেয়ে যুক্তরাজ্যের লন্ডন ও ভারতের দিল্লি হয়ে ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন স্বদেশ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রতিবছর এ দিনটি আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করি এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। আর ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সূচনাপাঠ থেকে তিনি ছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। ১৯৪৭ সালের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ এবং বাঙালি জনগণের ওপর সর্বপ্রকার নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৮ সালে ও ১৯৫২ সালে পাকিস্তানিরা আমাদের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র, ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের বিজিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের শেরেবাংলা, আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খান এবং কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সরকারকে হটিয়ে যখন সামরিক শাসক ইস্কান্দার মীর্জা ক্ষমতা দখল করে, তখনই শেখ মুজিব বুঝতে পারেন জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তান সৃষ্টির মরতবা। শেখ মুজিব ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী। তাই তিনি পাকিস্তানি কাঠামোর মধ্যে সমগ্র পাকিস্তানে ফেডারেল সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে স্বরাজ আন্দোলন শুরু করেন এবং স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে চৌধুরী রহমত আলীর বাসায় বিরোধী দলীয় সম্মেলনে ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্গবন্ধুর পেশকৃত দফাগুলো সাবজেক্ট কমিটি থেকেই বাতিল হয়। নেতৃবর্গ বলেন, শেখ মুজিবের প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন তথা ফেডারেল সিস্টেম প্রবর্তনের দাবি পাকিস্তান ভাঙার সুকৌশল ও ষড়যন্ত্র। এরপর শেখ মুজিব লাহোরে ২/১ দিন অবস্থান করে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং পূর্ব বাংলায় ছয় দফার আন্দোলন শুরু করেন এবং সমগ্র জনগণের ঘরে ঘরে তা প্রচার করেন। পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবের ছয় দফার প্রতি জনসমর্থন গড়ে ওঠে বিপুলভাবে।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানি মসনদ থেকে বিদায় নেয় ইস্কান্দার মীর্জা। সামরিক শাসক আইয়ুব খান মসনদ দখল করে। এই লোকটি ছিল আরও ভয়ানক। তিনি ময়মনসিংহের বটতলায় উকিল মোনায়েম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বানিয়ে পূর্ব বাংলার জেগে ওঠা মানুষের প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করেন। ছয় দফার দাবি সাতই জুনের ধর্মঘটের পূর্বে মুজিবকে গ্রেপ্তার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও সিলেটে শ্রমিক হত্যা এবং *দৈনিক ইত্তেফাক*সহ নির্ভীক সাংবাদিক তোফাজ্জল হোসেনকে বন্দি করা হয়। আর এসবের কারণে ছাত্র-জনতার জাগরণ ঘটে বাংলার পথে-প্রান্তরে। ছাত্ররা ১১ দফা নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। অপর দিকে সাতই জুনের পরে পাকিস্তান ভাঙার দায়ে শেখ মুজিব ও অন্যান্য বাঙালি দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে আইয়ুব-মোনায়েম রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা রজু করেন। সেনানিবাসে তাঁদের বিচার শুরু হয়। আর তখনই ঘটে সারা পূর্ব বাংলায় গণ-অভ্যুত্থান। এই গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব-মোনায়েম পরাজিত হয়। আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। সকল রাজবন্দিরা মুক্তি পায়। আইয়ুব পিন্ডিতে পাকিস্তান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গোল টেবিল বৈঠক ডাকে। বৈঠকে কোনো কিছুই সুরাহা হয় না। অগত্যা পাকিস্তানি পর্দা থেকে আইয়ুব বিদায় নিলে তারপরই দোসর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে। এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে। সত্তরের সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানা শুরু করে। ভুট্টো-ইয়াহিয়া ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেনদরবার চালায়। কিন্তু বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি অমীমাংসিত থেকেই যায়। জাতীয় পরিষদের সভা আহুত করে সামরিক জান্তা বন্ধ করে দেয়। পূর্ব বাংলার জনগণ মরিয়া হয়ে ওঠে। এদিকে সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু এহেন অবস্থায় স্বাধীনতার লক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীকে চরম আঘাত হানার দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন এবং প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। পাকিস্তানি ও পূর্ব বাংলার জনগণকে দমন করার লক্ষ্যে পাঞ্জাবি সৈন্যদের এদেশে পাঠায়। ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া পাঞ্জাবি কসাই টিক্কা খানকে বাঙালিদের নিধনের নির্দেশ দিয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। টিক্কা খান ২৫শে মার্চ পূর্ব বাংলায় শুরু করে গণহত্যা। শুরু হয় বাঙালির মরণপণ প্রতিরোধ। এদিকে পাঞ্জাবি সৈন্যের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা ঢাকার ইপিআরের ওয়্যারলেস সেন্টারের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে

পড়ে। এই ঘোষণা ঐদিন চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ রেডিও সেন্টারে প্রথম এবং দ্বিতীয় বার বেলাল মোহাম্মদ প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী কেন্দ্রে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। উল্লেখ্য, ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে নিয়ে যায় পাকিস্তানি সৈন্যরা। আর তখন দেশে চলছিল পাকিস্তানি সৈন্য প্রতিরোধের লড়াই।

এদিকে স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচার করে বেলাল মোহাম্মদের সহকর্মীরা যুদ্ধের বার্তা ঘোষণাকালে বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথে রয়েছেন, তাঁর নির্দেশেই সবকিছু চলছে। এই বার্তা প্রচারের পরই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ করাচির উর্দু *দৈনিক* জং-এ দুই প্রহরী বেষ্টিত বঙ্গবন্ধুর ছবি ছেপে জানান দেয়– বেতার কর্মীদের বার্তা মিথ্যে। শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি। এরপর থেকে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধুর কোনো খবর আমাদের জানা ছিল না। তিনি জীবিত বা মৃত তাঁর কোনো খবরই ১৯৭১-এর আগস্টের আগে জানা যায় না। উল্লেখ্য, ১০ই এপ্রিল পূর্ব বাংলার বিজিত দুই পরিষদের সদস্যদের সম্মতিতে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের ভবেরপাড়ায় প্রকাশ্যে দুনিয়ার তাবৎ সাংবাদিকদের সামনে আনুষ্ঠানিক শপথ নেয়। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু, তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব লাভ করেন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ।

এই সরকারই ভারতের কলকাতায় প্রবাসী হয়ে মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করে। বঙ্গবন্ধু প্রকাশ্যে না থাকলেও তাঁরই নামে প্রবাসী সরকারের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। ভারত সরকার সকল কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছে। দেশের অভ্যন্তরে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ। এসময় ভারত শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও ৫০ কিলোওয়াটের বেতার তরঙ্গ দিয়ে সহায়তা করে। মূলত পূর্ব বাংলার সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্যগুলো জয় বাংলার ভূমিতে পরিণত হয়। একাত্তরের আগস্টের মাঝামাঝি জানা যায় পাকিস্তানি ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার সমূহ আয়োজন সম্পন্ন করেছে। এই সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একাত্তরের মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ন্যায্য দাবি ও স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন ও বঙ্গবন্ধুকে বাঁচানোর লক্ষ্যে গোটা বিশ্বের মানবতাবাদী রাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ করেন এবং তিনি এসব দেশ সফর করে বাংলাদেশের বিষয়টি গোচরে আনেন। এসময় তাঁকে সরাসরি সমর্থন জানায় রাশিয়া, ইউরোপের সাম্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ। বিরুদ্ধে দাঁড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, শ্রীলঙ্কা ও মধ্যপ্রাচ্যের দু-একটি দেশ।

একাত্তরের সেই চরম মুহূর্তে পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করে ৩রা ডিসেম্বর। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বাঁধিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মাধ্যমে জাতিসংঘের দ্বারা যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করা। যেহেতু বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত কমান্ডো পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলে, বাংলাদেশে যুদ্ধ করছিল, যুদ্ধ বিরতি হলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটবে না। নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব কার্যকর করার আগেই সাতই ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশসহ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানি সৈন্যরা নাস্তানাবুদ হতে থাকে। বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসর, রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে বিশ্ব মানচিত্রে। আর পশ্চিম সীমান্তে ভারত একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা দেয়। ততক্ষণে বাংলাদেশের লাল-সবুজের বিজয় পতাকা উড়ে আকাশে। কিন্তু সেই রক্ত ঝরানো এবং বিজয়ের আনন্দের দিন বঙ্গবন্ধু কোথায়? নেই তাঁর হদিস। আনন্দের মাঝেও প্রিয়জনের অনুপস্থিতি হৃদয়কে বেদনায় ভরে দেয়।

একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানিদের পরাজয়ের পর ইয়াহিয়ার ক্ষমতা ভুট্টোর কাছে ছেড়ে দিতে হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের হাতে প্রায় এক কোটি যুদ্ধবন্দি সৈন্য এবং বিশ্ব জনমতের কাছে নতি স্বীকার করে এক পর্যায়ে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেবার লক্ষ্যে জেলখানায় সাক্ষাৎ করেন। এসময় মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধীও তৎপরতা চালান। ভুট্টো দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং পাকিস্তান তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধুর কথামতো তাঁকে লন্ডনে পাঠান। লন্ডনে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ তাঁকে রাজকীয় মর্যাদা দেন। ৯ই জানুয়ারি তিনি দিল্লি আসেন। দিল্লি আসার আগে ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে দিল্লিতে যাত্রা বিরতির অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু সেখানে আসেন সাইপ্রাস ও ওমান হয়ে। দিল্লিতে তাঁকে অভিনন্দন জানান ভারতের প্রেসিডেন্ট শ্রী বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। গার্ড অব অনারসহ ২১বার তোপধ্বনির মাধ্যমে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আব্দুস সামাদ তাঁকে বিমানের ভেতর থেকে নামিয়ে আনেন।

পরের দিন অর্থাৎ ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি বেলা ১টা ৪১ মিনিটে তিনি ঢাকা পৌঁছেন। দিল্লিতে থাকতেই বঙ্গবন্ধু স্ত্রী-পরিবার-পরিজন ও মা-বাবার সাথে হটলাইন ফোনে কথা বলেন। ১০ তারিখ ঢাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে রমনার মাঠে আসতে বিকেল হয়ে যায়। ঐ সময় বেতারে ধারাভাষ্য দেন শব্দসৈনিক কামাল লোহানী। উল্লেখ্য, দিল্লিতে পৌঁছার সময় বিশ্বের ২০টি দেশের কূটনৈতিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় তেজগাঁওয়ে একটি ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধু বিমান থেকে নেমে এলে পাকিস্তানের পরম বন্ধু ও বাংলাদেশের চরম শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল হাবার্ট মাথা নিচু করে বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানান। বঙ্গবন্ধুও একটু হেসে তাকে ধন্যবাদ জানান।

এরপরে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয় রমনার সেই সাতই মার্চের মাঠে। মঞ্চে উঠে বঙ্গবন্ধু কান্নায় ভেঙে পড়েন। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠের ৩৫ মিনিটের ভাষণে বলেন,

> আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেই বীর শহিদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।
>
> ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু

বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের মুক্তি সংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নেই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার প্রমাণ দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের নিচু করব না।...

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।

জনসভা শেষে তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে পৌঁছালে এক আবেগঘন পুনর্মিলনের দৃশ্য লক্ষ করা গেল। ১১ই জানুয়ারি ১৯৭২ *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত শওকত আনোয়ারের বর্ণনা মতে, সকাল থেকেই ভিন্ন মেজাজে ছিল ঐ বাড়ির সবাই। বাড়ির সব ছোটোমণিদের হাতে ছিল লাল ফুল। আর রাসেলই (১৯৬৪-১৯৭৫) ছিল এই ফুলকলিদের মেলার মধ্যমণি। 'আব্বু আসবে' তাই রাসেলের আনন্দ ধরে না। বেতার ধারা বিবরণীতে বিমানের নিরাপদ অবতরণের খবর প্রকাশের পর বেগম মুজিব একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ... বেতার ধারা বিবরণীর প্রতিটি শব্দ যে তাঁরা হৃদয় দিয়ে শুনেছেন। ... বাসায় টেলিভিশন ছিল না। তাই বেতার ধারা বিবরণীই ছিল তাঁর মুহূর্তগুলো ধরে রাখার একমাত্র অবলম্বন। ... সন্ধ্যে পৌনে ছ'টায় স্বাধীন বাংলার পতাকাবাহী একটি সাদা ক্যাডিলাক গাড়ি প্রবেশ করল এই বাড়ির প্রবেশ দ্বারে; গাড়ির দ্বার খুলে গেল। নেমে এলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব...। বন্ধু-বান্ধবরা যখন তাঁর ওপর ফুলের পাপড়ি বর্ষণে ব্যস্ত তখন তিনি তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেন। এরপর তিনি তাঁর ৯০ বছর বয়স্ক পিতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন এবং তাঁকে কদমবুসি করেন। আর ৮০ বছর বয়স্কা মা এসে ঢুকলে তিনি তাঁকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরে এসেছেন তার কালক্ষণ প্রায় অর্ধশতাব্দী বছর হলো। বঙ্গবন্ধু সহসা স্বদেশে ফিরে আসায় বাংলাদেশ নামক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে এক বাণীতে বলেন,

জাতির পিতাকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে প্রেরণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এ নিভৃত কারাগারে তিনি অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হন। প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আসামি হিসেবে তিনি মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে। জাতির পিতা ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি বাংলার মাটিতে প্রত্যাবর্তন করে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা দেন। বাঙালি জাতি ফিরে পায় জাতির পিতাকে। বাঙালির বিজয় পূর্ণতা লাভ করে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের দ্রুত দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বন্ধু দেশসমূহ দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি'র সদস্য হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান তৈরি হয়।

১০ই জানুয়ারি সমগ্র বাঙালির কাছে পরম প্রাপ্তির দিন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে ফিরে আসায় একাত্তরের বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। সেদিনের অপূর্ব বর্ণনা দিয়ে প্রখ্যাত কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা লিখেছেন–

মাটির প্রদীপ জ্বেলে প্রার্থনায় মাতা অনিদ্রিতা;
আকাশগঙ্গায় বুকে পাল তুলে এলে জাতিপিতা।
তোমার দুচোখে হাসে রাঢ়-বঙ্গ-হরিকেল নদী ও জলধি
হিমালয় চূড়া থেকে সমতট, দক্ষিণের দরিয়া অবধি।

তোমার আকাশে জ্বলে তারাবাতি, নেবুলার আলো,
তোমার বুকে ও মুখে বিজয়ের বজ্র চমকালো।
তোমার দুহাতে ওড়ে লক্ষ্যভেদী ধনুক ধ্রুপদী,
গণমন্ত্রে উল্টে পড়ে স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতার গদি।

তোমার স্নায়ুর তন্ত্রে বেজে ওঠে অর্জুনের বাঁশি:
তীব্র তীক্ষ্ণ উন্মীলিত; যুক্তিযুদ্ধ; ভালোবাসাবাসি।
তোমার ভাষার ধ্বনি লোকশ্রুত পাখিদের ঠোঁটে,
বৃক্ষ থেকে অন্তরীক্ষ তোমাকেই লক্ষ্য করে ছোটে।

তর্জনী উঁচিয়ে তুমি সবুজ বদ্বীপ জুড়ে বাজো অহর্নিশ
সন্তানেরা খুঁটে খায় জল-পলি, ধান-দূর্বা, শান্তির আশীষ।
প্রমিত বাঙালি বুকে তুমিই তো রুয়ে দিলে চূড়ান্ত বিজয়;
প্রমিত বাঙালি তুমি, পলল জাতির পিতা, নহলি নির্ভয়।

তোমার অমিত বুকে পুঞ্জীভূত মৃত্যুঞ্জয়ী যোদ্ধার সাহস
তোমার অস্তিত্বে জাগে বাঙালির সৃষ্টিজয়ী রূপ-রং-রস।
মুক্তি মানে সৃষ্টি-যুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা চিরকাল সৃষ্টিযুদ্ধময়:
বাঙালি অজেয় জাতি, কোনোকালে বাঙালির নেই পরাজয়।

তথ্যসূত্র

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ক্রোড়পত্র ২০১৬
২. *জয়বাংলার শেখ মুজিব*, স্বরবৃত্ত প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩. *সাকিন টুঙ্গিপাড়া*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

খালেক বিন জয়েনউদদীন: সাহিত্যিক, বঙ্গবন্ধু গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

ডিএফপিতে ‘চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়’ বিষয়ে সেমিনার

ডায়ানা ইসলাম সিমা

‘চতুর্থ শিল্পবিপ্লব’ বিষয়টি একেবারেই নতুন। আমরা অনেকেই এখনো এ সম্বন্ধে কিছু জানি না। অনেকে আবার বিষয়টির সঙ্গে সামান্য পরিচিত হলেও এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না। এক্ষেত্রে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত হতে হবে। সব দিক থেকে বলতে গেলে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে সভা-সেমিনার এখন সময়ের চাহিদা। ১১ই ডিসেম্বর ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে তিনটি বিষয় তাঁর সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন পিএএ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন

১২ই ডিসেম্বর ২০২১ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে (ডিএফপি) অনুষ্ঠিত হলো ‘চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়’ বিষয়ে সেমিনার। তথ্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এ সেমিনার। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. মকবুল হোসেন পিএএ, সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মো. রফিকুজ্জামান, সাবেক অতিরিক্ত সচিব। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন, অধ্যাপক, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া। সেমিনারটিতে ডিএফপির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে ‘চতুর্থ শিল্পবিপ্লব’ শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপক মো. রফিকুজ্জামানের এই প্রবন্ধটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

আঠারো শতকের শেষার্ধে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়, সেটিই হচ্ছে শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড বিশ্বের প্রথম শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন একদল বিজ্ঞানী যারা জার্মান সরকারের জন্য একটি উচ্চ প্রযুক্তিগত কৌশল তৈরি করেছিলেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লাউস শোয়াব ২০১৫ সালে *ফরেন অ্যাফেয়ার্সে* প্রকাশিত একটি নিবন্ধের মাধ্যমে শব্দটিকে বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করেন। শোয়াব তখন এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেন যার মাধ্যমে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং বায়োলজিকে (সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস) একত্রিত করে পৃথিবীকে উন্নতির পথে আরও গতিশীল করা যায়। শোয়াব আশা করেন, এই যুগটি রোবোটিক্স বুদ্ধিমত্তা, ন্যানোটেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের এবং সম্পূর্ণ স্বশাসিত যানবাহনের ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রযুক্তির যুগান্তকারী যুগ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শিল্পবিপ্লব কখন কীভাবে এসেছিল, সে সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানুষকে কীভাবে সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল– প্রবন্ধটিতে সেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব কীভাবে আসছে, এতে আমাদের করণীয় কী আছে– সেটিও তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধটিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের একটি গবেষণা প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে জানানো হয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। এসব আশঙ্কার ভেতরেই রয়েছে আগামী দিনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের বিশেষ সম্ভাবনা। বাংলাদেশে বর্তমানে তরুণের সংখ্যা প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি– যা

মোট জনসংখ্যার ৩০% এর বেশি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছরজুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সব থেকে বড়ো হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্পবিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানাবিধ কর্মক্ষেত্র। নতুন যুগের এসব চাকরির জন্য প্রয়োজন উঁচু স্তরের কারিগরি দক্ষতা। দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা সম্ভব হলে জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যান্য অনেক দেশ থেকে অনেক বেশি উপযুক্ত।

শিল্পকারখানার কী ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা লাগবে, সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষাক্রমে তেমন সমন্বয় নেই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় শিক্ষাব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। প্রাথমিক পাঠ্যক্রম থেকেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সারা দেশে সাশ্রয়ীমূল্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে হবে। কেবল পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের মানবসম্পদকেও যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হবে এই পরিবর্তনের জন্য। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, ব্লকচেইন– এসব প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। এসব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরবরাহ, চিকিৎসা, শিল্পকারখানা, ব্যাংকিং, কৃষি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করার পরিধি এখনো তাই ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত।

বর্তমান সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাস্তবায়নে সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু প্রয়োজন ব্যাপক হারে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ। সবাই মিলে আমাদের এখন থেকেই একটি সুপরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, শিল্প বা Industry বলতে আমাদের Traditional যে ধারণা মিল, কলকারখানা– এসব আমাদের মাথায় চলে আসে সাধারণভাবে। ঐ জায়গাগুলোর যে ডেভেলপমেন্ট সেগুলোকে ডেভেলপ করার তেমন আর কোনো সুযোগ নেই। এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে, সেটা কিন্তু নীরবে কাজ করে। এই ইন্ডাস্ট্রির কোনো শব্দ নেই। এর কার্যক্রম চোখে দেখা যায় না। এটা অনুভবও করা যায় না। শুধু ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ডিভিশন-এর কাজ বিভিন্ন রকম। কর্মক্ষেত্রগুলো তাদের সঙ্গে তাদের ডিভিশনের জন্য কাস্টমাইজড করে এই প্রোগ্রামগুলো যদি করে তাহলে উপকৃত হতে পারে।

ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্রে মানুষকে মোটিভেশনের দিকে গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তির কাজের যে মূল্যায়ন বা কাজ না করলে তার যে অবমূল্যায়ন, কোনোটিই যদি না হয়, মানুষ হিসেবে আমরা প্রাণিকুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে ইন্ডিভিজুয়ালি/ব্যক্তি বিশেষে ভাবা উচিত যে, আল্লাহপাক আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন আমার ক্ষমতার মধ্য থেকে আমার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমি কতটুকু চেষ্টা করি সোসাইটিকে Contribute করার জন্য। তিনি বলেন, আরেকটা জিনিস এখানে বোঝার আছে, অতিরিক্ত ফ্যান্টাসির মধ্যে যাওয়া যাবে না। এত বেশি বিলাসী জীবনের দরকার নেই মানুষের। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের খুব ইমার্জেন্সি ইস্যু আছে যেগুলো মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য সেগুলোকে আমরা Address করব। ফ্যান্টাসি জীবনের জন্য অনেক কিছু আছে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা Flow হয় এবং মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে সে পণ্য বা ডিভাইসগুলো মানুষকে কেনানো হয়। এটা এক ধরনের ঠিক সভ্যতার উলটো দিকে কাজ করছে বলে মনে হয়, যদিও অ্যাপারেন্টলি তারা মনে করে পৃথিবীকে সভ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা পৃথিবীকে ইনডাইরেক্টলি একটা হুমকির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ ঐ সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম, যে পরিমাণ অর্থ, যে পরিমাণ পরিবেশ বিপর্যয় ঘটানো হচ্ছে, যে পরিমাণ রিজার্ভ বা রিসোর্স নষ্ট করা হচ্ছে, যে পরিমাণ পাওয়ার নষ্ট করা হচ্ছে সেগুলোর কিন্তু আমাদের মূল্য দিতে হবে। পৃথিবীতে ৪০% (চল্লিশ পারসেন্ট) পাওয়ার নষ্ট হচ্ছে যে কাজে, যে ফ্যান্টাসির পেছনে সেগুলো আমাদের দরকার নেই। বরং সেগুলো আমাদের হুমকির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিগুলো যখন চলে তখন প্রথমত পাওয়ার-এর জন্য এনার্জি ব্যয় করতে হবে। বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োজন হবে। বিদ্যুৎশক্তি তো আপনা-আপনি সৃষ্টি হয় না। শক্তি এক রূপ থেকে আরেকরূপে রূপান্তর হয়। বিদ্যুৎ একটা শক্তি। এটা সরাসরি প্রকৃতি থেকে আসে না, এটা একটা রূপান্তরিত শক্তি। এই শক্তির অরিজিনাল ফর্ম হচ্ছে গ্যাস, কয়লা, তেল। আলোচক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন এসময় তার একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, তিনি একবার বড় পুকুরিয়া কয়লা খনিতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, সেখানে কয়লা উত্তোলন করতে গিয়ে যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে, মাটি ডেবে যাচ্ছে, সেখানে ধানক্ষেতগুলো এখন জলাশয় হয়ে গেছে। ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়ে মাটি ডেবে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে, কয়লা উত্তোলন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার বিপক্ষে তিনি নন, কিন্তু যে প্রোডাক্টগুলো প্রয়োজন নেই, যে কাজে বিদ্যুৎ অপচয় করার দরকার নেই, সেই কাজগুলোকে খুবই সূক্ষ্ম গবেষণা করে বের করে নিয়ে আসতে হবে। আজ থেকে একশো বছর পর আমাদের পরে আরও তৃতীয় প্রজন্ম তারা এসে যদি দেখে যে বাংলাদেশে গ্যাস নেই, শেষ হয়ে গেছে, কয়লা শেষ হয়ে গেছে, রিসোর্সগুলো শেষ হয়ে গেছে, তাহলে তারা কী বিপদে পড়বে। আমরা সেগুলো বিলাসিতা করে, সেগুলো অপচয় করে ধ্বংস করে দিয়ে চলে গেছি। তাহলে

অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন বক্তব্য দেন

কি তারা আবার সেই অন্ধকার যুগে চলে যাবে? আবার ঐ লাকরির চুলায় রান্না করবে? সুতরাং এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। পরিবেশের যে বিষয়গুলো, সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে পরিবেশ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলেছেন। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমাদের কী করণীয় আছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে পরিবেশের কী ধরনের Link আমরা করতে পারি– এক্ষেত্রগুলোতে আমরা কাজ করতে পারি। পরিবেশের যে বিষয়গুলো আমরা সকলেই জানি তার মধ্যে একটি বিষয় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এখন বিশাল হুমকি। বাংলাদেশের জন্য তো আরও হুমকি। কারণ আমাদের বদ্বীপ অঞ্চলে সমুদ্রের ধারের ছোট্ট একটা দেশ। সমুদ্রের পানির উচ্চতা যদি ২ মিটার বেড়ে যায় বাংলাদেশের অনেক অঞ্চল একেবারে তলিয়ে যাবে। দেশটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের জন্য। কার্বন ডাই-অক্সাইড কীভাবে নিঃসরণ, কতটুকু হচ্ছে– এটা আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কতটুকু আমাদের সর্বনিম্ন প্রয়োজন, আমরা যেটা ব্যবহার করছি সেটা দিয়ে আমাদের পরিবেশকে কতখানি দূষিত করছি– সেটা আমাদের জানতে হবে। সেটা জানার জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ Component ইন্টারনেট অব থিংস (IOT) বিশেষ কার্যকরী। IOT এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে যে, আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দিবে। ছোটো ছোটো ডিভাইস ব্যবহার করা হবে, ইন্টারনেটের সাথে সেটা সংযুক্ত থাকবে। সেখান থেকে ডাটা নিয়ে আমরা সেটা মানবকল্যাণে লাগাতে পারি। শিল্পোন্নত দেশগুলোকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের ক্ষেত্রে তদারকির আওতায় আনা দরকার। কোনো একটা ফোরামের মাধ্যমে প্রত্যেকটা দেশের উপরে চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে কে কতটুকু বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবে, কে কতটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করতে পারবে। এগুলো যদি কোটা বা Rationing করে দেওয়া হয় যে এর বেশি ব্যবহার করতে পারবে না, প্রয়োজন যাই থাকুক না কেন– এটার সমাধান দিতে পারে IOT। সেন্সর লাগাতে হবে। এই সেন্সর ডিভাইসগুলো প্রোটেক্টেড থাকবে। এগুলো পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড থাকবে। এক্ষেত্রে দরিদ্রতম দেশ থেকে শুরু করে সব দেশের সকলেই সচেতন থাকবে। এখানে যদি কোনো access হয়, সেটা বাংলাদেশ থেকে ওই ফোরামের একটা অংশ হিসেবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিও পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। সেখানে যদি কোনো access হয়, কোনো ডাটা পরিবর্তন হয় সেটা সহজেই জানতে পারবে।

ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বিগ ডাটা, ডাটা সাইজ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগুলো নিয়েও কথা বলেন। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি ব্যবহার করে ডাটাগুলোকে খুব সুন্দরভাবে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ভুলভাবে এবং বিভিন্ন warning generate করে অত্যন্ত চমৎকার কাজ হচ্ছে– এগুলো মানুষের কল্যাণের জন্য। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। বাংলাদেশে IOT ব্যবহার করার অনেক সুন্দর সুন্দর সুযোগ আছে। খরা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কৃষক বোঝে না মাটির যে moisture, মাটির যে pH লেভেল– এগুলো ঠিকমতো থাকছে কিনা। এক্ষেত্রে সেন্সর বেইজড IOT দিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নীরব ফল পাওয়া যায়, চোখেও দেখা যায় না, শব্দও নেই। আমাদের দেশের শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য–এই সমস্ত সেক্টরে ব্যাপক ব্যবহার হতে পারে। আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য, আমাদের ন্যাশনাল ইকোনমিক গ্রোথকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য, পুরোপুরি মানবকল্যাণে ব্যবহারের জন্য।

ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন বক্তব্যের শেষাংশে বলেন, বাংলাদেশের জনমিতিতে বাংলাদেশ এখন কিন্তু একটা Advantageous পজিশনে আছে। কারণ যে বয়সকালের মানুষ কাজ করে ঐ বয়সসীমার যে জনশক্তি বাংলাদেশে এখন huge percentage। সুতরাং এই জনগোষ্ঠী যারা উদ্যমী, তাদের ব্যবহার করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের যারা আমরা সিনিয়র। সুতরাং তাদের কাজে লাগাতে হবে।

প্রধান অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন পিএএ বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এসেছে আমাদের জীবনমানের পরিবর্তনের কারণেই, পরিবর্তন সাধনের জন্যেই এবং মানুষের স্বার্থের জন্যেই। আমাদের যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, যেটা আমরা করছি আমাদের উন্নত বিশ্ব যেটি করছে, এটা তাদের স্বার্থের জন্যই করছে এবং এটি আমাদের মানবসভ্যতার অনেক সভ্যতাকে বিপন্নের দিকেও ধাবিত করছে। তার বক্তব্যে উঠে এসেছে যেটা বলা হচ্ছে যে, ২০৩০ সালের ভেতরে আমাদের বর্তমানে যে employment nature অথবা pattern of employment, আমরা যে চাকরিবাকরি করি, আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, আমরা গাড়ি চালাই, জাহাজ চালাই– এ ধরনের চাকরি আর থাকছে না। আমাদের প্রযুক্তির যে অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে, ২০৩০ সালের ভেতরে আমাদের ৮৫% যে employment তৈরি হবে তার ধরন এখনও আমাদের এই মুহূর্তে অজানা। আজকে ২০২১ সালে বসে ২০৩০ সালে হবে না ২০৫০ সালে– এটা সঠিক বলা যাচ্ছে না। তাহলে আমাদের যে চ্যালেঞ্জটা আমরা কীভাবে মোকাবিলা করব এটিই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশের ৫০ লক্ষ ছেলেমেয়ে, মেয়েদের সংখ্যাই বেশি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে। সেখানে যদি রোবট রিপ্লেস করে তাহলে তারা কোথায় যাবে? আমাদের employment opportunity দিন দিন কমে যাচ্ছে। আমরা যে আগে Kodak Film ব্যবহার করতাম, ছোটোবেলায় ছবি উঠাতাম, সেখানে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল। Kodak এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানে আমাদের যে টেকনোলজির রিপ্লেস করেছে তা হলো মোবাইল। সুতরাং আমাদের টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টকে থামিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। টেকনোলজিকে মানুষের কল্যাণেও ব্যবহার করা যায়। আবার এটাকে খারাপ কাজেও ব্যবহার করা যায়। প্রশ্ন হলো এটমিক এনার্জিকে ভালো কাজে ব্যবহার করব, না খারাপ কাজে। এই যে আমাদের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে আমরা যে চ্যালেঞ্জের ভেতর পড়ছি সেটি কোন ধরনের, কী ধরনের চ্যালেঞ্জের ভেতর পড়ব– সে বিষয়েগুলো মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। সেক্ষেত্রে আমাদের এখন মাইন্ড সেটআপ করতে হবে। আমাদের তার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এটি নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আবার ভাববার বিষয় আছে যে, আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হলো পৃথিবী যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট নিয়ে আমাদের পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের এক সময়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাবারের ব্যবস্থা আমরা করতে পারতাম না পাকিস্তান আমলে এমনকি বাংলাদেশ-পরবর্তী সময়েও। আমরা এখন আঠারো কোটি মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি। আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বিজ্ঞানীরা উন্নত জাতের ধান আবিষ্কার করেছেন। আমাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানকে আমাদের বিজ্ঞানীরা মানুষের কল্যাণের জন্য কাজে লাগিয়েছেন।

সেমিনার সঞ্চালনা করেন স. ম. গোলাম কিবরিয়া, মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর *ফটোফিচার: মো. নাজিম উদ্দিন*

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন পিএএ আরও বলেন, আমরা অনেক প্রজেক্ট করি সেটি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন হয় না বা করা যাচ্ছে না। আমরা যারা পলিসি মেকিংয়ের সঙ্গে আছি আমাদের প্রয়োজনটা হলো যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের যুগের চাহিদার সঙ্গে তাদের সিলেবাস, তাদের কারিকুলাম, তাদের নতুন নতুন সাবজেক্ট আনবে। আমাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন সাবজেক্ট আসছে। এই আসাটার কারণও কিন্তু আমাদের যুগের সাথে বা ভবিষ্যতের একটা দক্ষ জনবল তৈরি করার জন্য যে ধরনের প্রশিক্ষিত জনবল দরকার সেটি তৈরি করার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেজন্য প্রস্তুত হতে হবে।

স্পেশালি আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এই কারণেই আমাদের বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল যে এডুকেশনগুলো আছে সেই টেকনিক্যাল এডুকেশনের দিকে আমাদের বেশি মনোনিবেশ করতে হবে। আমাদের বাংলাও পড়তে হবে, ভাষাও পড়তে হবে, আমাদের ইসলামের ইতিহাসও জানার প্রয়োজন আছে। আমরা আমাদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে মোকাবিলা করতে পারব কীভাবে– সেটি একটি বিষয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমাদের ছেলেমেয়েদের সেভাবে তৈরি করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি আমাদের Basic Education-টাকে সেভাবে তৈরি না করে দিতে পারে তাহলে কিন্তু তারা এই কর্মপরিসরে এসে, এই Service Field-এ এসে খুব একটা ভালো করতে পারবে না। অতএব এ ধরনের শিল্পবিপ্লবের যে চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবিলা করতে হবে, সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সে ধরনের সাবজেক্ট ইন্ট্রোডিউস করে আমাদের ছেলেমেয়েদের সেভাবে তৈরি করতে হবে– তাহলে তারা কাজে এসে সেটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। আমাদেরও সেভাবে একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে যাতে করে আমাদের সরকারের যে প্রয়োজন সরকারের সেই প্রয়োজনের সাথে যেন আমরা খাপ খাইয়ে নিতে পারি এবং যুগের চাহিদার সাথে সরকারের ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যাতে সম্পৃক্ত হতে পারি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন পিএএ বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। ২০০৯ সালের পর থেকে ২০২১ সালে এই স্বল্পসময়ের ভেতরে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের যে প্রসার ঘটেছে এবং প্রসার ঘটতে যাচ্ছে, ICT Division সরকারের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা বিস্ময়কর। এক্ষেত্রে তিনি হাইটেক পার্কের উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, যখন আমাদের হাইটেক পার্ক হচ্ছিল দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জেলায় তখন আমরা বুঝিনি যে হাইটেক পার্ক আবার কী? এটা আবার কেন প্রয়োজনীয়? এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, আসলে হাইটেক পার্ক আমাদের জন্য, আমাদের দেশের জন্য, আমাদের এই শিল্পবিপ্লব মোকাবিলা করার জন্য কতটা প্রয়োজনীয়। বক্তব্যের শেষাংশে তিনি বলেন, আমরা শিল্পের দিকেও যাব, আবার আমরা মানবিকও হব, টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্টের সঙ্গে আমাদের খাপ খাওয়াতেও হবে। যখন যেটি আসে সেটাকে সহজভাবে নেওয়ার মানসিকতা আমাদের থাকতে হবে। আজকের শিশুরা কিন্তু জন্ম থেকেই টেকনোলজির দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের যে বুদ্ধিমত্তা, বাঙালির স্বভাবে যে বুদ্ধিমত্তা আছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার– মানুষের ভেতর যদি চেতনা থাকে, দেশপ্রেম থাকে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থাকে তাহলেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা এই চতুর্থ বিপ্লব কেন, যত বিপ্লবই আসুক সেটাকে মোকাবিলা করে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ডায়ানা ইসলাম সিমা: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

স্বদেশে ফিরে তেজগাঁও বিমানবন্দরে উপস্থিত বিপুল জনতার অভিবাদনের জবাব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১০ই জানুয়ারি ১৯৭২)

মহাকাব্যের অমর কবির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শাফিকুর রাহী

মহাবীরের ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনকালে,
আপন আবাস উঠলো নেচে হাওয়ার তালে তালে।
পাক-দানবের কাছে যে তাঁর হয়নি নত শির,
ভাঙলো আঁধার বাধার প্রাচীর জগজ্জয়ী বীর।
উনিশশত বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি
ভাঙা ডেরায় ছড়ায় জ্যোতি, পিতার চোখে বারি।
রক্তেভেজা জমিন কাঁদে বৃক্ষ কাঁদে ধ্যানে
তাঁর আগমন স্বপ্ন জাগায় স্বজনহারার প্রাণে।

বাঙালি জাতির অধিকার হরণকারী অত্যাচারী পাকিস্তানি স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করতে গিয়ে বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে জাতির পিতাকে। সেসব অনেক অজানা তথ্যবহুল ইতিহাস আজও গ্রন্থিত হয়নি, তবে হবে হয়ত কোনো একদিন। আর তখন সে লোমহর্ষক বিভীষিকাময় কালো অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে জাতি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী একাত্তরের গণহত্যার দানবীয় সন্ত্রাসের প্রথম প্রহরে ঢাকার ধানমন্ডির ৩২নং সড়কের নিজ বাসভবনে রাত আনুমানিক ১২.৩০ ঘটিকার দিকে অতর্কিতে আক্রমণ করে কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। তিনদিন পর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানের জিন্দানখানা খ্যাত অন্ধকার কারাগারে। বড়ো নির্মমভাবে সে অন্ধকার সেলে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই পাকিস্তানি দস্যুদের জল্লাদখানায় বন্দি ছিলেন। আর এদিকে বঙ্গবন্ধুর প্রাণের বাংলা রক্তবানে ভাসে, ওই পাকিস্তানি দানবগোষ্ঠী শহর-নগর, গ্রামগঞ্জ, বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলে। মানুষের লাশের মিছিল ক্রমাগত বাড়তে থাকে সে বিভীষিকাময় কালরাতে। বাংলাদেশের অসংখ্য মুক্তিবাহিনী-বীর গেরিলা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু কখনো শত্রুর সঙ্গে আপোশ করেননি। কারণ বঙ্গবন্ধুর প্রাণের বাঙালি কখনো আপোশ করতে জানে না, পরাজয় মানে না।

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্র নিরপরাধ ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গণহত্যার আদিম বর্বরতায় মেতে ওঠে দখলদার বাহিনী। সে বীভৎস অমানবিক অপকর্ম বিশ্ববাসীর জানা। কোটি কোটি মানুষ বসতভিটে ছাড়া। নিরস্ত্র-নিরপরাধ নারী-শিশু কেউই রেহাই পায়নি পাকিস্তানি খানসেনাদের ভয়ানক আক্রমণ থেকে। বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক হয় প্রতিবাদে সোচ্চার। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী আন্দোলন-সংগ্রাম আর ত্রিশ লক্ষ প্রাণের আত্মদান, দুই লক্ষের অধিক মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর বেদনাবিধুর অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জিত হয়, বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষরের মাধ্যমে নির্লজ্জ পাকিস্তানি বাহিনী মাথানত করে পরাজয় মেনে নেয় বাঙালির কাছে। তারই আলোকে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করলেও জনগণের কাছে পুরোপুরি স্বাধীনতা মনে হয়নি। কারণ তখনও মনে হয়েছে বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্থহীন। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর শুনে লাখো মানুষের রক্তেভেজা শ্যামল মাটির সবুজ আঙিনায় সুরম্য পল্লবিত পুষ্প উদ্যানে জ্যোৎস্নার প্লাবনে আনন্দে আত্মহারা তাবৎ জনপদ। মহাকাব্যের অমর কবির শুভ আগমনকালে নেচে ওঠে সমুদ্রের ঊর্মিমালা, হাজার নদীর কলতানে নেচে ওঠে তামাম জমিন ও আসমান। যার মহানুভবতা ও বিরল আত্মত্যাগের মহিমায় একদিন জেগে উঠেছিল সমস্ত গৃহলোক।

যে মহামানবের অপ্রতিরোধ্য অহিংস অভিযানে কোটি মানুষ এক পতাকা তলে শামিল হয়ে যায়, তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুবর্ণ সকালের সোনালি রোদ্দুর জানান দেয় কালজয়ী মহাপুরুষের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের আপন ঠিকানা আজ পরিপূর্ণ স্বাধীন। আনন্দ অশ্রুতে ভাসমান কোটি জনতা। সে মহামানবের আগমনের শুভ

সংবাদ স্বজনহারা মুক্তিপাগল মানুষের অশ্রুভেজা কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল– 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে স্লোগানে কী ব্যাকুল আরাধনায় পাকিস্তানের অন্ধকার কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার সমীপে প্রার্থনারতকাল কাটে যে মহৎপ্রাণ মনীষীর, তিনি এমন আনন্দঘন মুহূর্তের অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলেন নিঃস্বার্থভাবে সারাটি কাল। জেল-জুলুমের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংগ্রামে বার বার ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও তিনি দৃঢ় অঙ্গীকার করেন বাংলার মানুষের অধিকার 'আমি জীবন দিয়ে হলেও প্রতিষ্ঠা করব'। তিনি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন মানবতার মুক্তির মিছিলে সৌহার্দ-সম্প্রীতির বিপ্লবী উপাখ্যান।

যাঁর সৌভাগ্যমণ্ডিত ললাটে অঙ্কিত পরম ভালোবাসার অবিস্মরণীয় অভিধান, বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন ক্ষণজন্মা রাজনীতিকের আবির্ভাব যুগে যুগে হয় না। বাঙালি জাতিকেও হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মতো এমন অসামান্য ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল আগমনের। তাঁর কারণেই আজ আমরা স্বাধীন দেশের ভাগ্যবান নাগরিক হিসেবে গর্ববোধ করি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর মহোৎসব পালন করি আমরা বঙ্গবন্ধুর প্রিয় বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের বিশালত্ব সমগ্র বাংলাদেশের চেয়েও অধিক বড়ো ছিল বলেই তো তাঁর এমন বিরল আত্মত্যাগের ফলে দুনিয়া জোড়া খ্যাতির উজ্জ্বল ধারায় আলোকিত মানুষের মনোলোক।

তাঁর সমকক্ষ নেতা আজও বিশ্বে জন্মায়নি, ভবিষ্যৎ-ই বলে দেবে বঙ্গবন্ধুর আসন বিশ্বের কোন উচ্চতায় পৌঁছবে। তিনি মাটি ও মানুষকে ভালোবাসার এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করেছেন– যা আজও সমগ্র বিশ্বে বিরল। তিনি প্রায় বলতেন, মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। সে কারণেই হয়ত নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন বাঙালির মুক্তির ধ্যানধারণায়। নিজের সুখ-শান্তিকে বিসর্জনের ভেতর দিয়ে তিনি বার বার প্রমাণ করেছেন বাঙালির পরম ভালোবাসার অমূল্য অবদানের গর্বগাথা। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁর মতো এমন বিশাল হৃদয়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার পরিচয়ই শুধু দিইনি, নিজের আত্মরক্ষায় কাপুরুষের মতো গর্তে লুকিয়েছিলাম। আর সেই আদিম বর্বর খুনিদের উল্লাসধ্বনিতে কম্পিত তৃতীয় আকাশ; গতিহারা প্রগতির সোনালি সূর্য, বৃক্ষেরা কান্নামগ্ন, পাখিরা গান ভুলে শোকভারে স্তম্ভিত। আর জনকহারা নিদারুণ সন্তাপে বাকরুদ্ধ কাব্যরাখালের বুকভাঙা মাতমে প্রকৃতির মনোরম ক্যাম্পাসে প্রাণের প্রিয় আপনহারার বিলাপধ্বনিত হয়।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হলো পাকিস্তানি দস্যুদল যে মহামানবকে হত্যার শক্তি ও সাহস পায়নি অথচ কী নির্মম সত্য– সে মহান নেতার স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কতিপয় ভয়ানক জাতিঘাতক কী নিষ্ঠুরভাবে সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করল! পাকিস্তানের ভয়ংকর শাসকগোষ্ঠীর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির রায়ে স্বাক্ষর করলেন তখনও কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে এর কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির মিয়ানওয়ালি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সেলের পাশে যখন কবর খোঁড়া হচ্ছে সে দৃশ্য বঙ্গবন্ধু জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে পান। তখন তিনি ভাবলেন যে, আজ রাতেই হয়ত তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে, এমন দুশ্চিন্তায় খানিকটা ভেঙে পড়ে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে দুরাকাত নফল নামাজ আদায় করে মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে প্রার্থনা করলেন, হে মহান রাব্বুল আলামিন তুমি আমার দেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষা করো। ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছেন বাংলার প্রাণপ্রিয় গণমানুষের পরম আপনজন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তখনও তিনি জানেন না তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে; তাঁর প্রিয় ভালোবাসার বিশ্বাসী মানুষ তাঁরই অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে তাঁর শুভ আগমনের প্রত্যাশায়।

তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতিমান সাংবাদিক রবার্ট পেইনের *দ্য টর্চার্ড অ্যান্ড দ্য ড্যাম্‌ড* উপন্যাস থেকে জানা যায়, ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বললেন যে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট আপনি কি শেখের ফাঁসি চান? নাকি পাকিস্তান চান! দুটির একটি আপনি করতে পারবেন। ভুট্টোর মুখে এমন কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান পাগলা কুকুরের মতো লাফিয়ে উঠলেন। আর ওই রাতেই জেলার হাবিব তার সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধুকে জানায় যে, তাঁকে কারাগার থেকে নিয়ে যাওয়া হবে অন্য জায়গায়। জেলার হাবিব আলী দীর্ঘদিন পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠজনের মতো আলাপকালে বললেন, শেখ সাহেব আপনি এখন আগের থেকে অনেক নিরাপদ। আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে বহুদূরে– ট্রাকে চড়ার সময় আপনি বসে পড়বেন, কোনো চিন্তা করবেন না। সকালে সূর্যের সোনালি আলোয় বঙ্গবন্ধু দেখতে পেলেন পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা জেলার হাবিব আলীর বাসা। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু ভাবেন, আমাকে এখানে আবার কেন আনা হলো? এমনটি ভাবতেই কিছুক্ষণের মধ্যে এসে হাজির হলেন ভুট্টো।

এমনিভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভুট্টো কয়েকবার দেখা করেন এবং কয়েকটি টাইপ করা কাগজের পাতায় (কনফেডারেশন-এ) বঙ্গবন্ধুকে স্বাক্ষর করতে বললে তিনি তা নাকচ করে দেন। বার বার একই কাগজে স্বাক্ষরের রহস্যটা বঙ্গবন্ধু হয়ত ঠিকই টের পেয়েছিলেন বিধায় ভুট্টোর সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। তারই আলোকে ৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে লন্ডনের উদ্দেশে পাকিস্তান বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় জানান জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুর গাড়ির দরজা খুলে দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু জানতে পেরেছিলেন প্রিয় স্বাধীনতার সুসংবাদটি।

হোটেলের ভেতর সারা রাত ছটফট করতে করতে কীভাবে কেটে গেল টের পেলেন না। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ভারতের দিল্লির পালাম বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলেন। ভারতের বিশাল জনসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি ভিভিগিরি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীসহ সে দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য বিদগ্ধজন। বঙ্গবন্ধুকে সামনে পেয়ে তাঁরা সবাই আবেগাপ্লুত। সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ হলো বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উঠে প্রথমেই ইংরেজিতে বক্তৃতা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ করে– নো নো বলে চিৎকার শুরু করলেন অর্থাৎ তারা সকলেই একসঙ্গে বলে উঠল যে, বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আর বাংলা বাংলা বলে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে কম্পিত হলো ভারতের মাটি ও মানুষ। নেচে উঠল গোটা ভারতের মানচিত্র, বিজয়ী বীরও বিষয়টি বুঝতে পেরে হাসিমুখে বাংলায় ভাষণ দেওয়া শুরু করলে মুহূর্তেই মুহুর্মুহু করতালিতে নয়াদিল্লি স্বাগত জানায় পিতাকে। বিশ্ব বীরের

আবেগজড়িত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো ভারতমাতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা।

বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময় যেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকারপ্রধানের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন সেখানেই কিন্তু তিনি পরম ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় অভিনন্দিত হয়েছেন। তাঁর ভূয়সী প্রশংসায় বিশ্ব রাজনীতির খ্যাতিমান নেতারা বঙ্গবন্ধুকে আপন করে নিয়েছেন খুব সহজে, তার প্রমাণ রয়েছে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থে। মা-বাবার আদরের ছেলের নাম খোকা, ছোটোবেলা থেকেই তাঁর এমন সব মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আনন্দ আভায় চমকিত হলো টুঙ্গিপাড়ার সর্বস্তরের মানুষজন। খোকার সাধারণ লোকজনের প্রতি পরম মমত্ববোধ ভালোবাসার অনন্য নজির স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে কিশোরবেলায়ই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন এবং অন্যকে স্বপ্ন দেখাতে তাঁর ভীষণ ভালো লাগে। ভাবতে অবাক লাগে যে অজপাড়ার একজন কিশোর কীভাবে নিজের মাথার ছাতা অন্য বন্ধুকে দিয়ে দেয় কিংবা নিজের গায়ের চাদর পথের কোনো এক ভিক্ষুককে দিয়ে দেওয়ার উদার মহৎ মানুষ হওয়ার স্বপ্নবীজ রোপণ করেন অবলীলায় আপন আলোয় আপন টানে।

জীবন-মৃত্যুর সংকট সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আমি বাঙালি, বাংলা আমাদের দেশ, বাংলা আমার ভাষা। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। জগতে কালে কালে যুগে যুগে এমন অনেক বুজুর্গ-বর্ষীয়ান ধ্রুবতারা মহৎপ্রাণ মনীষী জনপ্রিয় নেতা-রাষ্ট্রনায়ক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন্মেছেন, যেমন– কালমার্কস, লেনিন, মাও সেতুং, জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, চে গুয়েভারা, মার্টিন লুথার কিং, ফ্রেডরিক ডগলাস, নেলসন ম্যান্ডেলা, ফিদেল ক্যাস্ত্রো, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাস চন্দ্র বসু, ইয়াসির আরাফাত, সুকর্ণ, কামাল আতাতুর্ক, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ। বহু প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের বীরত্বগাথায় মানব পারাবার হয়েছে বিকশিত। মানুষ খুঁজে পেয়েছে সভ্যতার সোনালি সোপান গড়ার এমন অনেক কালজয়ী বিপ্লবী জাতীয় নেতা।

বিশ্ব বিধাতার কী এক অলৌকিক মহিমান্বিত উদ্যোগ, জগৎ সংসারে এমন সব মহৎপ্রাণ মনীষীগণকে পাঠিয়ে সাধারণ লোকজনকে ভিনদেশি বেনিয়া-নির্যাতিত স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে মানুষকে উদ্ধারের প্রেরণা জাগায়! যিনি অসম্ভবকে সম্ভবের দারুণ প্রভায় পথ চলেন সকল ঝড়ঝঞ্ঝা দুঃসহ দুর্গতির আঁধারকে মাড়িয়ে রাজনীতির প্রথম পাঠেই শপথ নিলেন মানুষকে কীভাবে ভালোবাসা যায়! কী করে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়! এমন সব অসাধারণ সংকল্পে ধনী-গরিব সব মানুষের সঙ্গে মিশতে শুরু করলেন বাঙালির হাজার বছরের আরাধ্য স্বপ্নসাধক টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিব। বাঙালির মুক্তির স্বপ্নসাধনায় ৬৮ হাজার গ্রামের প্রতিটি লোকালয়ের সব মানুষজন তাঁর চেনা, সবাই তাঁর আপনজন, এসব গরিব-দুখি মানুষের সুখ-দুঃখ মর্মবেদনা তাঁকে ভীষণভাবে ভাবায়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন এ নির্যাতিত-নিপীড়িত হতদরিদ্র মানুষকে নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তুলবেন ভিনদেশি দখলদারদের বাংলার স্বর্ণভূমি থেকে তাড়ানোর রণকৌশলে। জাগ্রত করতে হবে সকল কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষকে। তিনি সব সময় ভাবতেন সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলের কথা, তাদের সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বিনির্মাণে কী ব্যাকুল আরাধনা জাতির পিতার।

এমনিভাবে মানুষের মুক্তির জয়গান গাইতে গিয়ে বছরের পর বছর অন্ধকার কারাগারে দুর্বিষহ বন্দি জীবন কাটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। তাঁরই অমূল্য অবদানের গৌরবদীপ্ত অর্জন প্রিয় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকালে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ পঁচাত্তরের সকল শহিদ এবং মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ আত্মোৎসর্গকারী বীরযোদ্ধাদের, সেই সঙ্গে দুই লক্ষেরও অধিক সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। মহাকাব্যের অমর কবি, যাঁর তেজোদীপ্ত আলোকধারায় বাঙালি প্রাণভরে গেয়ে ওঠে– 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

শাফিকুর রাহী: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বিশ্বের প্রথম ডিজিটাল ডাকটিকিট প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, আমরা গর্বিত জাতি যে বিশ্বের প্রথম ডিজিটাল ডাকটিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে ওঠায় এই ঐতিহাসিক কাজটি আমরা করতে পেরেছি। এটি বাঙালি জাতির গর্ব, বাংলাদেশের গর্ব। আমাদের ডাকটিকিট বিশ্বের যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ ডিজিটাল পদ্ধতিতে এখন দেখতে পাবে। মন্ত্রী ১০ই ডিসেম্বর ঢাকায় ফেডারেশন অব ইন্টার এশিয়া ফিলাটেলির সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফিলাটেলিক ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ২০২১' শীর্ষক প্রথমবারের মতো ভার্চুয়াল স্মারক ডাকটিকিট প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ বপন করে গেছেন। তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েও সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের অংশীদার করেন ও ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর ডিজিটাল বিপ্লবের মাধ্যমে ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রার ডাক দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে আজ বাংলাদেশ জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

মোস্তাফা জব্বার আরও বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম ২০১৬ সালে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ঘোষণা করেছে। এর ৮ বছর আগেই বাংলাদেশ পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশে বিপ্লবের যাত্রা শুরু করে। এর এক বছর পর ব্রিটেন, ২০১৪ সালে ভারত এবং ২০১৯ সালে পাকিস্তান ডিজিটাল কর্মসূচির অভিযাত্রা শুরু করে। উদবোধনী অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ৩টি উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। প্রদর্শনীটি দেখার জন্য www.bangabandhu2021.com ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে। পরে মন্ত্রী এই উপলক্ষে একটি উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন।

প্রতিবেদন: লায়লা হাসান

অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ

এম এ খালেক

ঢাকায় নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া ব্লুম বার্নিকাট একবার প্রসঙ্গক্রমে বলেন, আমি যখন কলেজ পর্যায়ে অধ্যয়ন করছিলাম তখন ক্লাসে যেসব দেশ ভবিষ্যতে টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই তাদের তালিকা পড়ানো হতো। সেই তালিকায় বাংলাদেশের নাম ছিল। তখন থেকেই আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠি এবং এদেশে আসার জন্য ইচ্ছে পোষণ করতে থাকি। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সংশয়বাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করে বিশ্ব দরবারে ভালোভাবেই টিকে আছে। আমি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। তিনি মন্তব্য করেন, বাংলাদেশ টিকে থাকার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ কঠোর পরিশ্রমী, তাদের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'বটমলেস বাস্কেট বা তলাবিহীন ঝুঁড়ি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি শক্তিশালী মহল অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের টিকে থাকা নিয়ে প্রায়শই সন্দেহ প্রকাশ করতেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুজন অর্থনীতিবিদ নরওয়ের জাস্ট ফ্যালান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্যাক আর পারকিনসন বাংলাদেশকে নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, যার নাম ছিল *বাংলাদেশ: এ টেস্ট কেস।* তাদের এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য ছিল– অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। বাংলাদেশ যদি ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে টিকে যায় তাহলে যে-কোনো দেশের পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে যে, 'টেস্ট কেস' নয় বরং মর্যাদার সঙ্গে টিকে থাকার জন্যই তার সৃষ্টি হয়েছে। শত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ বিস্ময়কর সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী। তারা সঠিক নেতৃত্ব পেলে যে-কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারে।

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জনের ৫০ বছর অতিক্রম করেছে। একটি জাতির জীবনে ৫০ বছর খুব একটা দীর্ঘসময় নয়। তারপরও বাংলাদেশ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিগত দিনগুলোতে ঈর্ষণীয় সাফল্য প্রদর্শন করেছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার সবচেয়ে সহজ এবং গ্রহণীয় পদ্ধতি হচ্ছে দেশটির প্রবৃদ্ধি কেমন হচ্ছে, অর্জিত প্রবৃদ্ধি কতটা টেকসই তা বিবেচনায় নেওয়া। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য দেখিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের অর্জিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনেকটাই টেকসই বলা যেতে পারে। বাংলাদেশ বিগত ৫০ বছরে কীভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তা জানার জন্য আমরা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তফা কে. মুজেরীর মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি। তিনি বর্তমান নিবন্ধকারের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশ যখন বিজয় অর্জন করে তখন বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত একটি অর্থনীতি। অর্থনীতির প্রতিটি চালিকাশক্তি যুদ্ধের কারণে ছিল বিপর্যস্ত। সেই সময় দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনই ছিল সবচেয়ে জরুরি। বিশেষ করে আমাদের অবকাঠামো ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। উৎপাদন উপকরণগুলোও ছিল বিপর্যস্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও যাতে অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে না পারে সেই জন্য পাকিস্তানিরা ইচ্ছে করেই বাংলাদেশের উৎপাদন যন্ত্র এবং অবকাঠামো ধ্বংস করে দেয়।

আজ স্বাধীনতা এবং বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পর আমরা যদি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই, সেই সময় বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছিল তা পুরোপুরি মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী মর্যাদার আসনে আসীন। আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বিস্ময়কর। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে বাংলাদেশকে উন্নয়নের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিহিত করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বাংলাদেশ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে। পৃথিবীতে যে কয়টি দেশ সবচেয়ে দ্রুত গতিতে উন্নয়ন সাধন করছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছে। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উঠে আসবে।

বর্তমানে বিশ্বের যে সামান্য কয়েকটি দেশ কার্যকর উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। এমনকি করোনাকালীনও বাংলাদেশ উচ্চ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখব, স্বাধীনতার পর বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার খুব একটা বেশি ছিল না। সেই সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের পক্ষে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা কঠিনই ছিল। সেই সময় আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো প্রকট ছিল। খাদ্য সমস্যা ছিল প্রকট। আরও নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত ছিল দেশ। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সরকারের পক্ষে সেসব সমস্যা সমাধান করা বেশ কঠিন ছিল। তারপরও আমরা যদি ১৯৭১-১৯৭২ থেকে ১৯৭৪-১৯৭৫ অর্থবছর পর্যন্ত উন্নয়নের গতিধারাকে বিবেচনায় নিই তাহলে দেখব, সেই সময় প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কম ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই প্রবৃদ্ধির হার স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের চেয়ে বেশি ছিল। এই লক্ষণীয় প্রবৃদ্ধি আমাদের জন্য একটি ইতিবাচক দিকও বটে। আশির দশকে বাংলাদেশ গড়ে ৪ শতাংশের কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। এই সময় প্রবৃদ্ধির হার তেমন একটা বাড়ানো যায়নি। অনেকেই এই জন্য আশির দশককে 'লস্ট ডিকেট' বলে থাকেন। কিন্তু মনে করা হয়, সেই সময় আমাদের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময় এমন কিছু খাতের বিকাশ ঘটে যা পরবর্তীতে আমাদের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এই সময় তৈরি পোশাকশিল্পের বিকাশ শুরু হয়। পোশাকশিল্পের বিকাশের কথা বলার আগে আর একটি সেক্টরের বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। সেটি হচ্ছে এনজিও কার্যক্রম। এনজিও এই সময় তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম জোরদার করে। বিশেষ করে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের সম্পৃক্ত করে। অবশ্য একই সময়ে সরকারের পক্ষ থেকেও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। গ্রামীণ নারীদের মাঝে আর্থিক কার্যক্রম এবং সামাজিক নানা বিষয়ে সচেতনতা গড়ে উঠে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তারা সচেতন হয়ে উঠে। ফলে গ্রামীণ সমাজে এক ধরনের ইতিবাচক রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। সরকার এবং এনজিওর মিলিত প্রচেষ্টায় তৃণমূল পর্যায়ে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। তৈরি পোশাকশিল্প খাতের বিকাশ এই সময়ে শুরু হয়। জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতা শুরু হয়। সেই সময় সরকারিভাবেও বেশ কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ

দৃশ্যমান স্বপ্নের পদ্মা সেতু ও কর্ণফুলি টানেল

করা হয়, যা পরবর্তীতে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পরিবেশও সেই সময়ই সূচিত হয়। উচ্চ প্রবৃদ্ধির সেই ধারা এখনো বহাল রয়েছে। সেই সময় আমাদের দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রতি দশকে এক শতাংশের মতো করে বেড়েছে। আশির দশকে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ছিল সাড়ে তিন থেকে ৪ শতাংশ। করোনা-পূর্ব সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের উপরে চলে গেছে। আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই যে ধারাবাহিক অগ্রগতি তা অনেকটাই বিরল। বিশ্বে খুব কম দেশই আছে যারা আমাদের মতো এমন ধারাবাহিকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত আমাদের চেয়ে দ্রুত গতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ২০১৬ সালের পর ভারতের প্রবৃদ্ধি অনেকটাই কমে গেছে।

আশ্চর্যজনক মনে হলেও অনস্বীকার্য, আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা টেকসইভাবে ধরে রাখতে পেরেছি। কাজেই বলা যায়, আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাটা অনেকটাই টেকসই। আমাদের সামাজিক সূচকগুলোর প্রবৃদ্ধিও কিন্তু চোখে পড়ার মতো। সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই ভারত এবং পাকিস্তানকে অতিক্রম করেছে। সামাজিক সূচকে এই দৃঢ় অবস্থান আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাধীনতার পর আমাদের বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ৬ শতাংশ। এখন তা প্রায় ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ব্যক্তি খাত বিকশিত হয়েছে চমৎকারভাবে। গত অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ২১ দশমিক ২৪ শতাংশ। আমাদের সঞ্চয় বেড়েছে। অর্থাৎ অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি চালিকাশক্তিতে সফলতা অর্জন করেছি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিভিন্ন সূচকেও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এত দ্রুত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের নজির নেই বললেই চলে। বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে সফলতা অর্জন করেছে তা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, একমাত্র চীন ১৭ বছরে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশ এত অল্প সময়ের মধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে পারেনি। কাজেই বাংলাদেশ যদি ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে তাহলে সেটা হবে একটি অনন্য রেকর্ড। কারণ বাংলাদেশ চীনের চেয়ে এক বছর কম সময়ে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। চীন যে ১৭ বছরে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছিল সেই সময় চীনের জনগণের মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছিল সাড়ে ৭ শতাংশ হারে। কাজেই আমরা যদি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে চাই তাহলে চীনের চেয়েও দ্রুত গতিতে এগুতে হবে। আগামী এক দশকে আমাদের গড়ে ৯ থেকে ১০ শতাংশ হারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। অর্থনীতির যেসব সূচকের ওপর নির্ভর করে আমরা এতদিন প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এসেছি, যেমন তৈরি পোশাক, জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি খাত। শুধু এসব খাত দিয়ে ডাবল ডিজিট প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের অর্থনীতির সম্ভাবনাময় নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে, যার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। আমাদের আরও নতুন এবং শক্তিশালী আর্থিক চালিকাশক্তি খুঁজে বের করতে হবে।

বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আমাদের অনেক কিছুই করতে হবে। বিশেষ করে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার আরও অনেকটাই বাড়াতে হবে। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে প্রবৃদ্ধির হার অন্তত ডাবল ডিজিটে উন্নীত করতে হবে। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন দেশের বিনিয়োগ বাড়ানো। ডাবল ডিজিট প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে ব্যক্তি এবং সরকারি খাত মিলিয়ে বিনিয়োগের হার ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে। এটা অবশ্যই একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যেসব বিদেশি বিনিয়োগকারী আসবে, তারা উদ্বৃত্ত পুঁজি নিয়ে আসবেন। তাদের প্রয়োজনীয় লোকবল কিন্তু স্থানীয়ভাবেই জোগান দিতে হবে।

বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। যে দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগ কাজে লাগাতে পারে, সে দেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে উপযুক্ত স্থান করে নিতে পারে। বাংলাদেশকে এর সুফল কাজে লাগাতে হবে। বর্তমানে নমিনাল জিডিপির হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে ৪৩তম অবস্থানে রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৪তম। বাংলাদেশ বর্তমানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে দেশের আর্থিক বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০৪১ সালে তা ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে। বর্তমানে দেশের জিডিপির আকার হচ্ছে ২২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০৪১ সালে তা ২ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে। বাংলাদেশের প্রায় শতভাগ মানুষ এখন বিদ্যুতের আওতায় এসেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতির সবক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে আপন গতিতে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এক সময় ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এখনো ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রাসঙ্গিক বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু বাংলাদেশ ম্যালথাসের জন্যসংখ্যা তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করেছে। আরও অনেক দেশ অবশ্য ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশ দেখিয়ে দিয়েছে যে, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মোটেও প্রযোজ্য নয়। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। বর্তমানে তা দ্বিগুণের কিছু বেশি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৭ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। গত ৫০ বছরে বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি বাড়িঘর নির্মাণ, শিল্পকারখানা স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবাদের বাইরে চলে গেছে। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল ১ কোটি ২০ লাখ টন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এসে দেশে ধানের উৎপাদন হয়েছে ৪ কোটি ২৫ লাখ টন। গমের উৎপাদন হয়েছে ১২ লাখ টন, ভুট্টা ৫৭ লাখ টন, আলু এক কোটি ৬ লাখ টন, শাকসবজি ১ কোটি ৯৭ লাখ টন, তেল ফসল ১২ লাখ টন এবং ডাল জাতীয় ফসল উৎপাদিত হয়েছে ৯ লাখ টন। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন প্রমাণ করেছে যে, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব মোটেও সঠিক নয়। কৃষি খাতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন ধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়া ঘটেছে। এর অধিকাংশই ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশের কৃষি খাতের অর্জন নানাভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।

বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করে চলেছে। সদ্য সমাপ্ত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ রেকর্ড পরিমাণ ৪৯০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। নভেম্বর মাসে পণ্য রপ্তানি হয়েছিল ৪০৪ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বে দ্বিতীয়। বাংলাদেশের আর একটি সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে জনশক্তি রপ্তানি। বাংলাদেশ মূলত সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জনশক্তি রপ্তানি শুরু করে। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি খাত থেকে আয় করেছে ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাস (জুলাই-ডিসেম্বর) সময়ে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি খাত থেকে আয় করেছে ১ হাজার ২৩ কোটি মার্কিন ডলার। আগের বছর একই সময়ে এই খাত থেকে আয় হয়েছিল ১ হাজার ২৯৪ কোটি মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সম্প্রতি জিডিপি হিসাব করার ভিত্তি বছর পরিবর্তন করেছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৫৪ মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সম্প্রতি তাদের পূর্বাভাসে জানিয়েছে, বাংলাদেশ এ বছর ৬ দশমিক ৬ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। আগামী বছর এটা ৭ দশমিক ২ শতাংশ হতে পারে। চলতি অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশে ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, আমরা ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারব।

স্বাধীনতা এবং বিজয়ের পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের অর্জন সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম অর্থবছরে যে বাজেট প্রণীত হয়েছিল তার ৭৫ শতাংশই ছিল বিদেশি সাহায্যনির্ভর। এখন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির এক-তৃতীয়াংশ দেয় বিদেশিরা। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে বিদেশি সহায়তা এসেছিল ৫৫ কোটি মার্কিন ডলার। এখন তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭০০ কোটি ডলার। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৬৬ কোটি টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এসে তা ২ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ রাজস্ব আদায় বেড়েছে ১ হাজার ৫৬৬ গুণ। দেশে শিল্পকারখানার সংখ্যা ১৯৭২-১৯৭৩ সালে ছিল ৩১৩টি। বর্তমানে তা ৪৬ হাজার ২৯১টিতে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ দশমিক ৮৪ কোটি ডলার থেকে ৩ হাজার ৮৭৫ দশমিক ৮৩ কোটি ডলার। স্বাধীনতার পর প্রথম জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। এখন তা ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে দেশে দরিদ্র মানুষের হার ছিল ৮৯ শতাংশ। এখন তা ২০ শতাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেতে যাচ্ছে ২০২৬ সালে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আজীবন সংগ্রামের মাধ্যমে একটি দেশ উপহার দিয়ে গেছেন। আর তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে।

এম এ খালেক: অর্থনীতি বিষয়ক কলামিস্ট ও বিডিবিএলের অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক, khaleque09@yahoo.com

উন্নয়ন-অগ্রগতির আরও একটি বছর

৭ই জানুয়ারি সরকারের বর্ষপূর্তি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মাননা

- জাতিসংঘের SDG অগ্রগতি পুরস্কার
- WITSA এর Eminent Persons Award

বাংলাদেশ: দৃপ্তপদে উন্নয়ন অভিযাত্রায়

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল সংকটাপন্ন। দেশে কৃষি ছিল অচল, শিল্প বন্ধ, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অবকাঠামো বিধ্বস্ত, ব্যাংকগুলো অর্থশূন্য বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল খালি। রাষ্ট্রযন্ত্র অকেজো এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মাত্র দু'টি রাষ্ট্রের (ভারত ও ভুটান) মধ্যে সীমিত ছিল। এছাড়া, ভারত থেকে ফেরত আসা প্রায় এক কোটি এবং পারিবারিক অর্থনীতি ধ্বংসে হয়ে যাওয়া দেশে থাকা আরো অসংখ্য সহায়-সম্বলহীন মানুষ খাবারের জন্য ত্রাণের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দেশে ফিরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হয়ে হাল ধরলেন শক্ত হাতে। তিনি দেশ গড়ার জন্য মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ে পেয়েছিলেন। এরই মধ্যে তিনি দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে একটি ভিত তৈরি করতে সমর্থ হন। ১৯৭৪ সালে অতি বৃষ্টি, উপর্যুপরি বন্যা ও উদ্ভূত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং কিছু মুনাফালোভী মানুষের খাদ্য মজুদদারির কারণে দেশের একাংশে যে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হয় তা দ্রুত কাটিয়ে উঠে তিনি দেশের অগ্রযাত্রার পথ রচনায় ১৯৭৪-এর শেষের দিকে আবার মনোযোগ দেন।

SDG অগ্রগতির সনদপত্র হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তিনি ১৯৭৫-এর প্রথম দিকে সমবায়ভিত্তিক দেশ গড়া ও দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যেই সেই পথ অনুসরণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ সকলকে ন্যায্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এগিয়ে চলার কথা বলেন, যাতে দেশের মানুষ শোষণহীন, বৈষম্যহীন সমাজে সকল মানবাধিকার

ইউনেস্কো- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার

MoTIV Creations Limited এর প্রতিনিধির হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাম পাশে শেখ রেহানা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করেছে ইউনেস্কো যার অর্থমূল্য ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। এবছর পুরস্কারটি পেয়েছে উপাত্তভিত্তিক প্রতিষ্ঠান MoTIV Creations Limited.

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ৬ প্রস্তাব

জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে ০৬টি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলো হলো:

- কোভিড-১৯ টিকা- সবার জন্য ন্যায়সঙ্গত ও সাশ্রয়ী মূল্যে টিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অবিলম্বে টিকা প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- জলবায়ু সংক্রান্ত- ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, নিঃসরণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং টেকসই অভিযোজনের জন্য অর্থায়ন ও প্রযুক্তির অবাধ হস্তান্তর।
- শিক্ষা সংক্রান্ত- ডিজিটাল সরঞ্জামাদি ও সেবা, ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধার সহজলভ্যতা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ এবং এজন্য জাতিসংঘের অংশীদারিত্ব ও প্রয়োজনীয় সম্পদ নিশ্চিত করা।
- স্বল্পোন্নত দেশের টেকসই উন্নয়নে সহযোগীদের সহায়তা- স্বল্পোন্নত দেশের টেকসই উত্তরণ ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে প্রণোদনাভিত্তিক উত্তরণ কাঠামো প্রণয়নে সহায়তা বৃদ্ধি।

- স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ
- বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের নতুন রেকর্ড ৪৮.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- 5G-তে বাংলাদেশ

দেশগুলোর উপর এবং স্বল্প আয়ের দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত দেশগুলোর উপর চাপ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। আবার নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থায়নে এবং ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কাজেই বৈদেশিক সহায়তা জরুরি কিন্তু তা এখনও পাওয়া গিয়েছে সামান্যই। তবে বাংলাদেশের অভিযোজন কার্যক্রম সর্বত্র প্রশংসিত। কিন্তু শেষ বিচারে উন্নত বিশ্ব প্রয়োজনানুসারে দ্রুত ও পর্যাপ্ত গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ যদি না কমায় অবস্থার দ্রুত এবং ব্যাপক অবনতি হবে, যা সামাল দেয়া উন্নয়নশীল বা উন্নত কোনো দেশের পক্ষে, এমনকি সবদেশ একসঙ্গে এগিয়ে আসলেও কার্যকরভাবে সম্ভব না হতে পারে। আর বাংলাদেশের অবস্থা এমনিতেই খুব নাজুক। একথাগুলো বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোরালোভাবে তুলে ধরে আসছেন অনেক দিন ধরে। সর্বশেষ গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ-২৬-এও তিনি তা করেছেন।

করোনা মহামারি-পূর্ব সময়ে বাংলাদেশের বিশ্বনন্দিত অর্জনের সংক্ষিপ্ত কিছু দিক উপরে তুলে ধরেছি। এখন আসি অন্যান্য চ্যালেঞ্জের কথায়। এক্ষেত্রে প্রথমে করোনা মহামারির কথা বলতে চাই। এই মহামারি ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে সময় সময় বিভিন্ন মাত্রায় বাংলাদেশের উপর আঘাত হেনে চলেছে। তবে সব দেশের মতো বাংলাদেশ শুরুতে হোঁচট খেলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এই মহামারি জীবন রক্ষা ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ উভয় দিক থেকে মোকাবেলা করছে। করোনা পরীক্ষা, আক্রান্তদেরকে চিকিৎসা দান, টিকা সংগ্রহ করে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থাকরণ, করোনা আক্রান্ত না হওয়ার জন্য সচেতন করে তোলার দিক এবং জীবিকা সংকটে পড়া মানুষদের উত্তরণে খাদ্য ও অর্থ দিয়ে সহায়তা এবং উদ্যোক্তাদের উৎপাদন বা সেবাদান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান সফলতার সঙ্গে করে চলেছে। তাই সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর্থসামাজিকভাবে বিধ্বস্ত সকলকে সহায়তা দানে সরকারের সাথে যুক্ত হয়েছে সমর্থ অনেক মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান। ফলে তেমন কোনো হাহাকার সৃষ্টি হয়নি।

করোনাকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ঈর্ষণীয়। ২০২০ ও ২০২১ রাজস্ব সালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ছিল। যে স্বল্প সংখ্যক দেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ সেগুলোর মধ্যে একটি। শুধু তাই নয়, যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো করেছে এবং পাঁচ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ সেই দেশগুলোর অন্যতম। পাশাপাশি রেমিট্যান্স বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। তাই মাথাপিছু আয় ২০২১ সালের শেষের দিকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫৫৪ ডলারে। এবছর প্রবৃদ্ধি আরো বেশি হবে প্রক্কলন করা হচ্ছে। কেননা অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। আবার যদি মহামারির মাত্রা খুব বেশি না বাড়ে, বাংলাদেশ দ্রুতই সংকট কাটিয়ে ত্বরান্বিত উন্নয়ন ধারায় ফিরে আসবে। তবে যারা পিছিয়ে পড়েছে, বিশেষ করে অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী এবং দ্রারিদ্র্যের চাপ যাদের উপর বেড়েছে তাদের দিকে এই পুনরুদ্ধার ও পুনর্জাগরণের প্রক্রিয়ায় অধিকতর জোর দিতে হবে। অন্যথায় দেশে বৈষম্য আরো বেড়ে যাবে যার ফলে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

করোনা মহামারী ছাড়াও কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চিহ্নিত করা আছে। অনেকগুলো আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা আছে। এগুলোর সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি, বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হলে। উক্ত ইশতেহারে চিহ্নিত কয়েকটি সমস্যা নিম্নরূপ:

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হবে; প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য-সহযোগিতা লাভের সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত করা হবে; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে; সর্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করার সুব্যবস্থা করা হবে; দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়পরায়ণ, জনগণের সেবায় নিয়োজিত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে; স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তর এর মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন সুনির্দিষ্ট করা হবে এবং এগুলোকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল ও অর্থায়ন নিশ্চিত করে যথাযথভাবে কার্যকর করে তোলা হবে; একটি জনবান্ধব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে হাতে নেয়া কাজ অব্যাহত থাকবে; দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা ঘোষণা করা হয়েছে; ঘুষ, অনুপার্জিত আয়, কালোটাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি, পেশিশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার ভিত্তিতে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা হবে; এবং বৈষম্য দূরীকরণে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জোরদার করা হবে এবং অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। এই সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। সমস্যা চিহ্নিতকরণ তা সমাধান করার প্রধান পূর্বশর্ত।

বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া গান্ধী পুরস্কার ২০২০ শেখ রেহানাকে হস্তান্তর করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ভোগ করে মানব-মর্যদায় বসবাস করতে পারেন। প্রত্যেক গ্রামে একটি সমবায় হবে, কারো জমি বা অন্য কোনো সম্পদ কেড়ে নেওয়া হবে না। তবে গ্রামের সবাই মিলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। জমি বা অন্যান্য সম্পদের মালিকরা উৎপাদনের/আয়ের ন্যায্য অংশ পাবেন। সমবায় একটি অংশ পাবে তা থেকে যারা শ্রম দেন তাদের অংশ পাবেন এবং একটি অংশ সরকারি কোষাগারে যাবে। প্রত্যেক গ্রাম, সমবায়ের আওতায় একটি গ্রাম উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হবে। এই তহবিলে কিছু অর্থ আসবে সমবায় থেকে, আর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে সরকারের বাজেট থেকে। এটা খুবই অগ্রসর চিন্তা ছিল, সেই প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তির সহযাত্রী হতো এবং দ্রারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক দেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার সম্পদ সরকারের কাছে সরাসরি আসতো।

বর্তমানে বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈষম্য বাড়ছে। করের মাধ্যমে, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে অর্থ খুবই কম আসে সরকারের কাছে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর মিলে কর-জাতীয় উৎপাদন অনুপাত ৯ শতাংশের কম। পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালে তা ১৮ শতাংশের অধিক। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার পর স্বার্থান্বেষীরা দেখে যে যদি বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবিত উন্নয়নধারা প্রবর্তিত হয় তাহলে তাদের নিজেদের সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্ভব হবে না। এই ধান্ধাবাজরাও দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারিদের সঙ্গে মিলে বঙ্গবন্ধুকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করে এবং সফল হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যার পর দেশের অর্থনীতি ভিন্ন পথে ধাবিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদের পথে দেশ হাঁটতে শুরু করে। ১৯৮০-এর দশকে অগ্রগতি হয় সামান্যই। ১৯৯০-এর দশকেও উন্নয়ন গতি পায়নি। তবে ঐ দশকের দ্বিতীয়ভাগে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা হচ্ছে কৃষিতে ভর্তুকি দেয়া। তখনও দেশ উঁচু মাত্রার সহায়তা নির্ভর এবং সহায়তা দানকারি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ ঘোর আপত্তি জানায় এই ভর্তুকির ব্যাপারে। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে শেখ হাসিনার সরকার কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভর্তুকি দেয়, ফলে ২০০০ সাল নাগাদ দানাদার খাদ্যে বাংলাদেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি গড়ে বছরে ৫.৮% ছিল, তবে অগ্রগতি ধারাবাহিক ছিল না। অন্যান্য খাতেও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়নি। বরং যথেষ্ট দোলাচল লক্ষনীয়। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৯ পর্যন্ত অর্থাৎ করোনা মহমারির প্রার্দুভাব পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সূচকে ধারাবাহিক ও ত্বরান্বিত উন্নতি অর্জিত হয়। প্রথম পাঁচ বছর প্রবৃদ্ধির হার ছয় শতাংশের অধিক, পরের তিন বছর সাত শতাংশের অধিক এবং ২০১৯ সালে ৮.২ শতাংশ ছিল। পৃথিবীর খুব বেশি দেশে উল্লিখিত সময়ে এরকম ধারাবাহিক অর্জন ঘটেনি। পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রাপ্তি দ্রুত বাড়তে থাকে। ২০১৮-১৯ সালে ৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৯-২০ সালে ১৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতি হয়। ফলে মাথাপিছু আয়ও দ্রুত বাড়ে এবং ২০১৯ সালে ১৯০৯ ডলারের উন্নীত হয়। তাছাড়া, রপ্তানিও বিশেষ করে তৈরি পোষাক উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও দ্রুত বাড়তে থাকে। সামাজিক সূচকের দিকে তাকালে দেখা যায় জন্মালগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে (১৯৭২ সালে ছিল ৪৬ বছর), মাতৃমৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে এগিয়ে আছে। শিক্ষার হার ২০১৯-এ উন্নীত হয় ৭৪ শতাংশে (২০০৭ সালে ছিল ৪৭ শতাংশ) । শিক্ষা অবকাঠামো, বিশেষ করে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সারাদেশে ব্যাপকভাবে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে। ঝরে পড়ার হারও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়েই উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থাৎ কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতেই দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। উভয় খাতেই সরকারি সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষিখাতে ভর্তুকি ও কৃষিঋণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়। দারিদ্র্যের হার ২০১৯ সালে নেমে আসে ২০.৫ শতাংশে (২০০৫ সালে ছিল ৪০ শতাংশ) এবং অতি দারিদ্র্যের হার প্রায় ১১ শতাংশে। কৃষি উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বয়স্কভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং অন্যান্য দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ড। ২০১৯-২০-এ জাতীয় উৎপাদের ২ দশমিক ৬ শতাংশ এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে মূলত দু'টি কারণে। একটি হচ্ছে অনুকূল সরকারি নীতিকাঠামো ও সহযোগিতা, অপরটি হলো সেই পারিপার্শিকতায় সকল পর্যায়ের মানুষের শ্রম। তাদের মধ্যে আছেন কৃষক, কৃষি শ্রমিক, অন্যান্য শ্রমিক, অতি ক্ষুদ্র থেকে বড় উদ্যোক্তা, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল মানুষ।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সচেতনভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা, করণীয় নির্ধারণ, প্রকল্প ধারণা, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন সম্বন্ধে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ দ্রুত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে কমিয়ে আনতে উন্নত বিশ্ব এবং দ্রুত শিল্পায়নরত উন্নয়নশীল

ডিএফপি নং- ০৮/০৬.০১.২০২২

- অভিবাসীদের অধিকার- অভিবাসী গ্রহণকারী দেশগুলোকে অভিবাসীদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং তাদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- রোহিঙ্গা ইস্যু- রোহিঙ্গা সঙ্কট নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে টেকসই ও গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের জন্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন ও সাফল্যের কিছু তুলনামূলক চিত্র

সাফল্য/অর্জন	২০২১ সাল	২০০৬ সাল
বাজেট	৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা	৬১,০০৬ কোটি টাকা
জিডিপি বৃদ্ধি	৫.২ শতাংশ, যা এশিয়ার মধ্যে সবার ওপরে। করোনাকালে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক ছিল।	৫.০৪ শতাংশে
জিডিপির আকার	৩৫ লাখ ৩৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকা	৪,৮২,৩৩৭ কোটি টাকা
মাথাপিছু আয়	২ হাজার ৫৫৪ মার্কিন ডলার	৫৪৩ ডলার
রেমিটেন্স আয়	২৪.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪৮.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
রপ্তানি আয়	৪৫.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	১০.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
আইসিটি খাতে রপ্তানি	১.৩ বিলিয়ন ডলার	-
তৈরি পোশাক রপ্তানি	বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, চীন প্রথম এবং ভিয়েতনাম তৃতীয়	-
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন	বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। চাল ও সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয় ও আলু উৎপাদনে সপ্তম	খাদ্যে ঘাটতির দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল বাংলাদেশ
দারিদ্র্যের হার	করোনাকালের অব্যবহিতপূর্বে দারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে ২০ শতাংশের নিচে, অতি দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশ	দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ। অতি দারিদ্র্যের হার ২৪.২৩ শতাংশ
সমুদ্রসীমা জয়	আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে ১,১৮,৮১৩ বর্গ. কি.মি. সমুদ্র এলাকার উপর অধিকার অর্জিত হয়েছে	কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি
পদ্মা সেতু	পদ্মা সেতুর অগ্রগতি ৯৬% এরও বেশি। ৩০ জুন ২০২২ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্তের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে	উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, পরবর্তীতে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছিল
মেট্রোরেল	ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে এমআরটি লাইন-৬ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রামে মেট্রোরেল চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।	কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি
বীর নিবাস	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আবাসনের লক্ষ্যে ৪,১২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা নেওয়া হয়েছে, উপকারভোগী ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা	কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	১৪৩টি, ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ১ লক্ষ ০৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ উপকারভোগী প্রায় সোয়া কোটি এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৫ কোটি	-
ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান	মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয়েছে	কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি
বিদ্যুৎ	দেশের জনসংখ্যার প্রায় শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।	৪৭ শতাংশে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় ছিল
ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারকারী	ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সিমের সংখ্যা ১৩ কোটি (প্রায়) এবং মোবাইল ব্যবহারকারী সিমের ১৮ কোটি।	৩৫ লাখ এবং ২ কোটি ১৮ লাখ
গড় আয়ু	৭৩.৬ বছর	৬৫.৪ বছর
মডেল মসজিদ কাম ইসলামিক সেন্টার	সারাদেশে জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ কাম ইসলামিক সাংস্কৃতিককেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।	[illegible]
কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত নিরসনে সরকারি প্রণোদনা	২৩টি প্যাকেজে মোট ১,২৮,৪৪১ কোটি টাকা।	-
কোভিড-১৯ টিকা	প্রথম ডোজ ৭,৪৪,৮৩,০৭২, দ্বিতীয় ডোজ ৫,২৮,৪৩,৩৫৫ (০২.০১.২০২২ পর্যন্ত)	-
শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার	শিশু মৃত্যুর হার ২১ (প্রতি হাজারে) ও মাতৃ মৃত্যুর হার ১.৬৯ (প্রতি লাখে)	শিশু মৃত্যুর হার ৫০ ও মাতৃ মৃত্যুর হার ৩.৪৮
১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে কর্মসংস্থান হবে কমবেশি ০১ কোটি লোকের।	কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি
আমার গ্রাম আমার শহর	শহরের সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো	কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করতে চাই। আমি ভরসা করতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চিহ্নিত ও নতুনভাবে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধান করে এবং ইতিবাচক দিকগুলোকে সুসংহত ও ত্বরান্বিত করে আমরা দৃপ্তপদে এগিয়ে চলবো ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা, ২০৩১ নাগাদ দেশকে অন্তর্ভূক্তিমূলক উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরিত করা, এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে। ❑

লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, অর্থনীতিবিদ, সমাজ চিন্তক, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ এবং স্বাধীনতা পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ১০ মেগা প্রকল্প

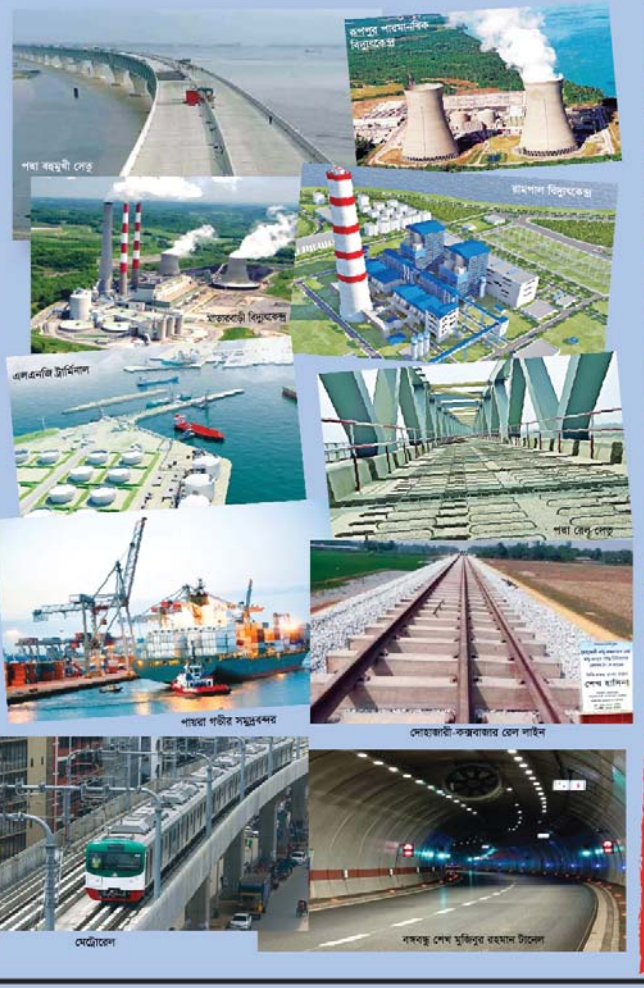

'সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের ভাবী বংশধরদের এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে হবে' [১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩]
– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরা

কাজী সালমা সুলতানা

জানুয়ারির ১৬ তারিখ ১৯৭২। এক বিদেশি সাংবাদিককে বঙ্গবন্ধু বলেন, বিচার কাজের শুরুতে চেয়েছিলাম পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজীবী এ কে ব্রোহি আদালতে আমার পক্ষে আইনি লড়াই করুক। কিন্তু কয়েকটি কার্যদিবস শেষে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বিচারের নামে যা চলছে তা স্রেফ প্রতারণা। তাদের আসল উদ্দেশ্য আমাকে ফাঁসিতে ঝুলানো। তখন আমার নির্বাচিত আইনজীবীকে নিষেধ করি বিচার নামের এই তামাশার অংশী হতে।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি কারাগারে আটক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২৫শে মার্চ গভীর রাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ততক্ষণে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়ে দিয়েছেন। গ্রেপ্তার করে প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন পর সেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি হয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি কারাগারে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধুকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে কাটাতে হয়। আগস্ট মাসে মিয়ানওয়ালি কারাগারে শুরু হয় বিচার কাজ। বিচার কাজ প্রায় শেষ আর তখনই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। ঢাকায় পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করে। তখনও বঙ্গবন্ধু খবরটা জানতে পারেননি। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝুলাতে চান।

এদিকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর গোটা পাকিস্তানে তীব্র গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়। এই গণ-অসন্তোষের মুখে ২০শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইনপ্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান পদত্যাগ করেন। ক্ষমতায় আসেন পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো। ক্ষমতায় বসে ভুট্টো বাস্তব পরিস্থিতিতেও শেষ চেষ্টা করতে চান। তিনি চান জিন্নাহর পাকিস্তানকে রক্ষা করতে। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শুধু বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তাই নয়, পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে পাকিস্তান হয় বিপর্যস্ত। এই সময় পাকিস্তান রক্ষা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার ওপর বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করতে রয়েছে আন্তর্জাতিক চাপ।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে আনা হয় রাওয়ালপিন্ডির কাছে একটি রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায়। ভুট্টো এলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বঙ্গবন্ধু তখনও ঠিক জানেন না তাঁর বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি। তবে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক হিসেবে ভুট্টোর কথায় তিনি বুঝে গেলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন আর ভুট্টো একটি খণ্ডিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। এসময় ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন পাকিস্তানের সঙ্গে একটি যোগসূত্র রাখেন। তিনি ভুট্টোর জবাবে জানিয়ে দিলেন, তিনি জনগণের সঙ্গে আগে কথা বলতে চান। অবশেষে ভুট্টো পিআইএ-এর একটি বিশেষ বিমানে জানুয়ারির ৮ তারিখে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন।

এ সময় দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁরা ভারত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছেন। আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল ভারত থেকে এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর দেশে ফেরা। প্রয়াত কূটনীতিক ফারুক চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *জীবনের বালুকাবেলায়* লিখেছেন, 'অকস্মাৎ আলোচনা কক্ষের দরজাটা সশব্দে খুললেন মানি দীক্ষিত। পুরো নাম জে এন দীক্ষিত।... কক্ষে ঢুকেই জানান, এই মাত্র খবর এসেছে শেখ মুজিব মুক্তি পেয়েছেন। তিনি ইতোমধ্যে পাকিস্তান ত্যাগ করেছেন। খবর শুনার সাথে সাথেই ভেঙে গেল বৈঠক। সম্মেলন কক্ষটি ভেঙে পড়ল স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে।'

৮ই জানুয়ারি ভোরে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিশেষ বিমানটি লন্ডন পৌঁছালো। তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালি কূটনীতিবিদ রেজাউল করিম ও মহিউদ্দিন আহমেদ। বঙ্গবন্ধু উঠলেন লন্ডনের অভিজাত হোটেল ক্লারিজেসে। প্রবাসী বাঙালিরা ছুটে এলো হোটেলের কাছে। বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্য হোটেলের পাশের রাস্তায় লেগে গেল ভিড়। আর হোটেল কক্ষে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা। এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু অবহিত হয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ আর প্রবাসী সরকারের নেতৃত্ব সম্পর্কে। কথা বলে নিয়েছেন কয়েকজন নেতার সঙ্গে। আয়োজন হলো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন, ঠিক যেমন একজন রাষ্ট্রনায়কের দেওয়া উচিত। বিশ্বের মানুষ অন্য আরেক বঙ্গবন্ধুকে চিনল, শুনল, জানল। পরদিন ৯ই জানুয়ারি। লন্ডন সময় রাত ৮টা। বাংলাদেশে তখন রাত ২টা। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া একটি বিশেষ কমেট বিমানে জাতির পিতা লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশে রওনা হলেন। বিমানবন্দরে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বিদায় জানাতে এলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তা ইয়ান সাদারল্যান্ড ও লন্ডনে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার আপা বি পন্থ।

স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরছেন বঙ্গবন্ধু। এ খবর দেশেও পৌঁছে গেছে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশে ফিরছেন, এই আনন্দে সে রাতে বাংলাদেশের অনেক মানুষ নির্ঘুম কাটিয়েছেন। তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনা করে অনেকে নফল নামাজ পড়েছেন, রোজা রেখেছেন। মসজিদে বিশেষ মোনাজাত হয়েছে, মন্দিরে পূজা দিয়েছে, গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে বহন করা বিমানটির প্রথম গন্তব্য ভারতের রাজধানী দিল্লি। মাঝপথে জ্বালানি নেওয়ার জন্য কিছুক্ষণের যাত্রাবিরতি সাইপ্রাসের নিকশিয়া ও বাহরাইনে। লন্ডন ছাড়ার আগে ভারতের হাইকমিশনার টেলিফোনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। ৩০ মিনিট ধরে চলল সেই আবেগঘন আলোচনা।

১০ই জানুয়ারি সকাল ৮টায় বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে। জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে শীতের তীব্রতা থাকে অত্যধিক। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে ভারতের জনতার ঢল নেমেছে। বিমানবন্দরে তখন উপস্থিত ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। আছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাও।

বঙ্গবন্ধু একটি জাতির মুক্তির মহানায়ক। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনে যেমন রাষ্ট্রাচার অনুসরণ করা হয়, ঠিক তাই করা হয় বঙ্গবন্ধুর আগমনে

পালাম বিমানবন্দরে। ফারুক চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "(সকাল) আটটা বেজে দশ মিনিট। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া রুপালি কমেট বিমান ধীরে ধীরে এসে সশব্দে সুস্থির। তারপর শব্দহীন কর্ণভেদী নীরবতা। সিঁড়ি লাগল। খুলে গেল দ্বার। দাঁড়িয়ে সহাস্যে, সুদর্শন, দীর্ঘকায়, ঋজু, নবীন দেশের রাষ্ট্রপতি। অকস্মাৎ এক নির্বাক জনতার ভাষাহীন জোয়ারের মুখোমুখি। সুউচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি আবেগের দুটি শব্দ। 'জয় বাংলা'। তখন দিল্লির সকল ধরনের ভিভিআইপি আর সাংবাদিকদের ভিড়ে পালাম বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকর্মীদের অবস্থা কাহিল। বিমান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সম্মানে একুশবার তোপধ্বনি করা হয়। তারপর একটি চৌকস সশস্ত্রবাহিনীর গার্ড অব অনার। দিল্লিতে প্রথমবারের মতো সেনাবাহিনীর ব্রাসব্যান্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজানো হলো 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।"

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় পাশের সেনানিবাস ময়দানে। দিল্লির রাস্তায় তাঁদের গাড়ি বহরের ওপর পুষ্পবর্ষণ চলতে থাকে। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত। সমবেত জনতার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তার জন্য ভারতকে অভিনন্দন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু উষ্ণ ভাষণ দেন। ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু একই মঞ্চে বক্তৃতা করেন সেদিন। ইন্দিরা গান্ধী হিন্দিতে দেওয়া তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ করে বলেন, 'তাঁর শরীরকে জেলখানায় বন্দি করে রাখা হলেও তাঁর আত্মাকে কেউ বন্দি করে রাখতে পারেনি। তাঁর প্রেরণায় বাংলাদেশের মানুষ সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে।... এই যুদ্ধের সময় আমরা ভারতের পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য তিনটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এক. যে শরণার্থীরা ভারতে আছে তারা সময় হলে ফিরে যাবে; দুই. আমরা মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করবো ও বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়াবো; তিন. শেখ সাহেবকে (শেখ মুজিবুর রহমান) আমরা দ্রুত জেল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবো। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রেখেছি।'

এরপর বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ ইংরেজিতে শুরু করলে উপস্থিত হাজার হাজার ভারতীয় দর্শক একসঙ্গে সমস্বরে চিৎকার করে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার অনুরোধ করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর দরাজ কণ্ঠে বাংলায় বক্তৃতা শুরু করেন। বক্তৃতার শুরুতে 'ভাই ও বোনেরা' বলতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে ভারতের অভ্যর্থনা সভার জনস্রোত। এই ভাষণে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান ভারতকে, সকল সহায়তার জন্য। তিনি বলেন, 'আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, আপনাদের সৈন্যবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য ও সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছেন চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে আপনারা জানেন, আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার সেলের (কারাকক্ষ) মধ্যে বন্দি ছিলাম কিছুদিন আগেও। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই যেখানে তিনি চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁর কাছে এবং তাঁর সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার জনসাধারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞ। আর যেভাবে এক কোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং থাকার বন্দোবস্ত আপনারা করেছেন...।'

বঙ্গবন্ধু এই ভাষণে তাঁর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপরিচালনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন, পরে যা বাংলাদেশের সংবিধানেও সংযুক্ত করা হয়। তার মধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম। অন্যদিকে পররাষ্ট্রনীতিতেও যুক্ত হয় সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি।

এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় অনুরোধ করেন, বঙ্গবন্ধু যেন যাত্রাপথে কলকাতা হয়ে যান। বিনয়ের সঙ্গে তিনি জানালেন, যাওয়ার পথে কেন? যে রাজ্যের মানুষ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এত ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের পৃথকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে তিনি অতিসত্বর কলকাতা আসবেন।

কথা ছিল দিল্লি থেকে ঢাকা আসতে বঙ্গবন্ধু ভারতের রাষ্ট্রপতির বিশেষ বিমান 'রাজহংস' ব্যবহার করবেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিমানটি দিল্লি থেকে লন্ডন ফিরবে। এরই মধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিমান থেকে মালপত্র রাজহংসে তোলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জানান, বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে যাত্রার মাঝপথে ব্রিটিশ বিমান ছেড়ে দেওয়াটা অসৌজন্যমূলক হবে। সুতরাং বাকি পথটাও তিনি একই বিমানে যাবেন। আবার মালপত্র স্থানান্তর হলো। দিল্লি থেকে বঙ্গবন্ধুর যাত্রাসঙ্গী হলেন ফারুক চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের সেই প্রসন্ন অপরাহ্নে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে অনুধাবন করেছিলাম যে আমাদের নবীন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে কূটনীতি আর কূটনৈতিক আচরণে দীক্ষা লাভের আমার রয়েছে যথেষ্ট অবকাশ।'

দিল্লির পর্ব শেষ করে বাংলাদেশ সময় ১টা ৪১ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে বহন করা কমেট বিমান তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ২৯১ দিন পর জাতির পিতা প্রত্যাবর্তন করছেন। মুজিব তো শুধু বঙ্গবন্ধু নন, মুজিব তো শুধু জাতির পিতা নন, মুজিব তো শুধু রাষ্ট্রনায়ক নন, মুজিব বাংলার প্রাণ, মুজিব বাঙালির প্রাণ। তাঁকে একনজর দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধবনিতা সেদিন ঢাকা বিমানবন্দরে জমায়েত হয়। এ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে *দৈনিক বাংলা* লিখেছিল, 'রুপালি ডানার মুক্ত বাংলাদেশের রোদ্দুর। জনসমুদ্রে উল্লাসের গর্জন। বিরামহীন করতালি, স্লোগান আর স্লোগান।... বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসেছেন রক্তস্নাত বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরীতে দখলদার শক্তির কারাপ্রাচীর পেরিয়ে।... আর শপথের প্রতীক বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন তাঁর স্বজনের মাঝে। চারধারে উল্লাস, করতালি, আকাশে নিক্ষিপ্ত বদ্ধ-মুঠি, আনন্দে পাগল হয়ে যাওয়া পরিবেশ– যা অভূতপূর্ব, শুধু অভূতপূর্ব। এই প্রাণাবেগ অবর্ণনীয়।' (*দৈনিক বাংলা*, ১১ই জানুয়ারি ১৯৭২)।

বিমানবন্দরের শুরু হয় নেতার সংবর্ধনা। দেশের সর্বস্তরের জনতা, বিদেশি কূটনীতিক, ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক নেতা, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত। এ পর্ব শেষ করে শুরু হয় যাত্রা রেসকোর্স ময়দানের উদ্দেশে। সেই রেসকোর্স ময়দান আজ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। সেখানে অপেক্ষা করছে লক্ষ লক্ষ জনতা। প্রকৃতপক্ষে বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান– গোটা পথজুড়েই চলে সংবর্ধনা। অবশেষে বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছান। লাখো লাখো প্রতীক্ষমাণ আবালবৃদ্ধবনিতার করতালিতে আকাশ-বাতাস হলো মুখরিত, জয়ধ্বনি ডুবিয়ে দিলো সবকিছুকে। নেতা এগুলেন মঞ্চের দিকে, চারদিক থেকে শুরু হলো পুষ্পবৃষ্টি। সমবেত জনতার উদ্দেশে জাতির পিতা ভাষণ দেন। স্বাধীন দেশের মহান নেতা হিসেবে মুক্তভূমিতে এটাই বঙ্গবন্ধুর প্রথম ভাষণ।

তথ্যসূত্র

১. সজীব কুমার বনিক, *বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন*;
২. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সংবাদপত্র;
৩. তৎকালীন ছাত্রনেতাদের বক্তব্য থেকে সংগৃহীত।

কাজী সালমা সুলতানা: প্রাবন্ধিক, রাজনৈতিককর্মী, সংবাদকর্মী, salma15august@gmail.com

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার দিন

বোরহান মাসুদ

বাঙালির অবিসংবাদিত মহান নেতা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসছেন। আসছেন তাঁর সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন স্বাধীন স্বদেশ ভূমির মাটিতে। দীর্ঘ নয় মাস তাঁর নির্দেশে অকুতোভয় বাংলার মানুষ জাতি-ধর্ম-বয়স ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যুদ্ধ করেছে– মুক্তির যুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে জয়ী হয়ে ছিনিয়ে এনেছে জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা। স্বাধীন আকাশ আলো করে পতপত করে উড়ছে তিরিশ লাখ জীবনের বিনিময়ে পাওয়া লাল-সবুজ প্রিয় পতাকা। দেশ যুদ্ধে বিধ্বস্ত। তিনি আসছেন তাঁর সেই জনপদে।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় তাদের পশ্চিম নরকপুরীতে। তাঁকে তারা হত্যা করতে চেয়েছিল। জেলখানায় তাঁর কক্ষের সামনে কবরও খুঁড়েছিল। বঙ্গবন্ধু কখনোই মৃত্যুভয়ে ভীত হননি। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য তিনি সবসময় জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাঙালির সেই প্রিয় নেতাকে তারা মারতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হলে তারা তাঁকে মুক্তি দেয়।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ বাঙালির মহা-আনন্দের সেই দিনটি। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের ২৫ দিনের দিন বঙ্গবন্ধু বীরবেশে স্বাধীন স্বদেশে পা রাখলেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি প্রথমে যান লন্ডনে। তারপর দিল্লি হয়ে ঢাকায় পৌঁছালেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রিয় নেতা।

বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত মানুষের ঢল। কারণ, এই রেসকোর্স মাঠেই আজ এসে দাঁড়াবেন তিনি। এই রেসকোর্স ময়দানই আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান– যেখানে দাঁড়িয়েই ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সেখানেই স্বাধীন বঙ্গবন্ধু আজ মুক্তজাতির কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি প্রকাশ করবেন। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে খোলা জিপে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসলেন প্রিয় সহযোদ্ধারা। আছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল মোমিনসহ অনেকে।

বঙ্গবন্ধু এলেন। কোটি জনতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে, লাখো শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে, বিপন্ন বিধ্বস্ত স্বদেশের দুর্দশা দেখে বঙ্গবন্ধুর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত এক কবিতার জবাবে তিনি বলেন, 'তারা বীরের জাতি, বাঙালি নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে।'

বঙ্গবন্ধু পূর্বে বার বার বলা তাঁর সেই কথাটি আবার স্মরণ করলেন– ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি আজ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু আজ নেই। মুক্ত স্বদেশকে সাজিয়ে তোলার সংগ্রামে যখন তিনি ব্যস্ত, সেই মুহূর্তে মাত্র চার বছর যেতে না যেতেই একাত্তরের পরাজিত পক্ষের ঘাতকরা তাঁকে সপরিবার হত্যা করল। বাঙালি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শের অনুসারী শক্তি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে দেশবাসীও সংকল্পবদ্ধ। আমাদের শিশুদের জন্য একটি আদর্শ, সুন্দর ও নিরাপদ স্বদেশ গড়ে তুলতে আমরা সবাই বদ্ধপরিকর।

এই ঐতিহাসিক ১০ই জানুয়ারিতে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি প্রিয় মহান নেতা, আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বোরহান মাসুদ: কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও উন্নয়নকর্মী, borhanmasud2@gmail.com

তথ্য অধিকার আইন সুশাসনের অঙ্গীকার

জিনাত আরা আহমেদ

জনগণের ক্ষমতায়ন সুশাসনের অন্যতম শর্ত। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়তে সরকার বদ্ধপরিকর। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির লক্ষ্যে জনগণের ক্ষমতায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকার নির্বাচনি অঙ্গীকার হিসেবে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য জানা জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জনগণের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এ আইনে।

রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি হলো প্রধান প্রতিবন্ধক। দুর্নীতির কারণে দেশ কখনোই সামনে এগোতে পারে না, দেশের মানুষ ভোগান্তির শিকার হয় প্রতিনিয়ত। দুর্নীতিরোধে সরকারি প্রশাসনে ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ, যা সরকারি কর্মচারীদের দায়ে আবদ্ধ করেছে। প্রতিটি অফিসে সিটিজেন চার্টার স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ডিজিটাল নথি বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। সব অফিসে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও গণশুনানির মাধ্যমে সেবার প্রকৃতি ও মানের বিষয়ে জনগণ যাতে সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে ও অভিযোগ করতে পারে তার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ সবকিছুর ভিত্তি হলো তথ্য অধিকার আইন। সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ এই আইন।

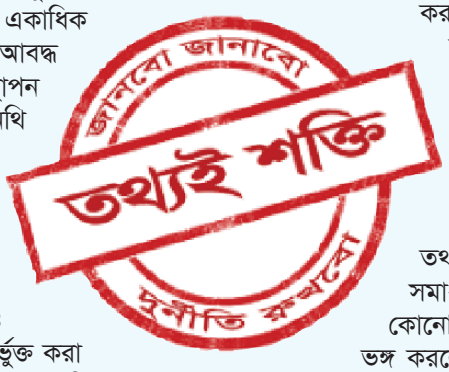

১৯২৩ সালে অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট করা হয়, এটা ব্রিটিশ সরকার করেছিল। যদিও এ আইনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে তথ্য সংরক্ষণ করার কথা বলা আছে। কিন্তু আইনের শিরোনাম অফিসিয়াল সিক্রেসি হওয়াতে কারও ক্ষেত্রে অসাধু চিন্তার বশবর্তীতে কোনো অফিসের সাধারণ তথ্যগুলোকে প্রকাশ করার অনীহা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা ছিল লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে আইনে সুস্পষ্ট বিধান না থাকাতে সাধারণ তথ্য প্রদানে কর্মকর্তাদের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তথ্য পাওয়ার বাধা দূরীকরণে বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করে। এই আইনে সকল নাগরিক এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও যে-কোনো সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে তার প্রয়োজনীয় তথ্যটি চাইতে পারবেন। শুধু তাই নয়, স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ এবং সংরক্ষণ করার কথাও বলা আছে এ আইনে।

বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি আধুনিক, অনন্য ও প্রাগ্রসর আইন। অন্যান্য আইনে কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিন্তু এই আইনে জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে কর্তৃপক্ষের কাজ, সেবার মান ও বাজেটের হিসাব চায়। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকলে ৩০ দিন লাগতে পারে। জীবন, মৃত্যু, গ্রেপ্তার সম্পর্কিত তথ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে।

তথ্য অধিকার আইনে সরকারি ও বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত বা পাবলিক ফান্ড ব্যবহারকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যে-কোনো তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যদি নির্দিষ্ট অফিসে গিয়ে সময়মতো তথ্য না পাওয়া যায়, যদি তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুল হয় তবে নাগরিক আপিল করবেন ঐ অফিসের ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক প্রধানের কাছে। আপিল আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত জবাব না পেলে তথ্য কমিশনে আপিল করতে হবে। কোনো কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করলে বা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা যাবে। এক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে তথ্য কমিশনও অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সাক্ষ্য আইন ১৮৭২-এর মতে, দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় যিনি আদালতে বিচারপ্রার্থী প্রমাণের দায় তার। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করলে প্রমাণের দায় কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার, অভিযোগকারীর নয়। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে। না পারলে জরিমানা, ক্ষতিপূরণের আদেশ বা বিভাগীয় মামলার সুপারিশ তার বিরুদ্ধে হতে পারে।

তথ্যগ্রহীতা ও তথ্যদাতা কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব সমাধানের শেষ পর্যায় হচ্ছে তথ্য কমিশন। কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে আইন ভঙ্গ করলে তাকে আইনের আওতায় আনতে তথ্য কমিশন দায়বদ্ধ। আপিল আবেদন সঠিকভাবে পূরণ করে জমার রসিদ বুঝে নিতে হবে। যদি আবেদন করতে দেরি হয়, তাহলে দেরির কারণ উল্লেখ করে আবেদন করা যাবে। শুনানি হলে যথাসময়ে শুনানিতে উপস্থিত থাকা, এভাবে ৪৫ দিন বা সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশন থেকে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে। যদি কমিশনের দেওয়া সিদ্ধান্তে আপিলকারী সন্তুষ্ট না হন, তাহলে তিনি হাইকোর্টে রিট আবেদন করতে পারবেন।

এই আইনে সময় নির্ধারিত করা আছে। তাই নাগরিকের দায়িত্ব হলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল আবেদন করা।

তথ্য চেয়ে না পেলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আইনি সাফল্য অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করবে, যা সরকারি-বেসরকারি দপ্তরকে দায়ে আবদ্ধ করার পাশাপাশি তৎপর করে তুলবে তথ্য দিতে। সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমের খুঁটিনাটি তথ্য জনগণ জানতে পারলে কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। তখন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে জনগণের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবে তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, জনগণ পাবে তাদের নাগরিক অধিকার, নিশ্চিত হবে সুশাসন।

জিনাত আরা আহমেদ: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস খুলনা, khulnapid@gmail.com

নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার ১০০ বছর

অনুপম হায়াৎ

বল বীর–
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি’
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি’
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া...
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাতৃর!

এগুলো হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। পৃথিবীর কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে ‘বিদ্রোহী’ হচ্ছে এক অনন্য সৃষ্টি।

১৪২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর ২০২১) এই কবিতা রচনার শতবর্ষ পূর্তি। এটি যেন কবিতা নয়, এক মহাকবিতা।

দুই

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘বিদ্রোহী’ কবিতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন ‘আগুনের গোলা সদৃশ’, তেমনি ভাব-ভাষা-ছন্দ-গাঁথুনি-কল্পনা-ব্যঞ্জনা ও চেতনায় ‘নব’ এবং ‘অভিনব’। চির তারুণ্যের প্রেরণাজাত এই কবিতা নজরুলকে দিয়েছিল ‘বিদ্রোহী’ অভিধা। বিশিষ্ট মার্কিন পণ্ডিত ড. হেনরী গ্লাসি বিশ শতকে রচিত দুটি শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে ‘বিদ্রোহী’ একটি বলে মন্তব্য করেছেন।

নজরুলের সেই বিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনার স্থান, সময়, তারিখ এবং প্রথম প্রকাশ সম্পর্কে মুজাফ্‌ফর আহমদ যে তথ্য আনয়ন করেছেন প্রায় সব নজরুল গবেষক, লেখক, ব্যাখ্যাকার, জীবনীকারই সেই তথ্য গ্রহণ করেছেন। মুজাফ্‌ফর আহমদ যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন তাহলো:

(১) ‘বিদ্রোহী’ কবিতা নজরুল রচনা করেছিলেন মুজাফ্‌ফর আহমদের কলকাতার ৩/৪-সি তালতলা লেনের দোতলা বাড়ির নিচতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের কোনো এক তারিখের রাত্রি দশটা থেকে ভোরের মধ্যে;

(২) সকালে মুজাফ্‌ফর আহমদকেই প্রথম কবিতাটি পড়ে শোনান নজরুল;

(৩) নজরুল কবিতাটি প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিলেন;

(৪) ‘বিদ্রোহী’ কবিতার দ্বিতীয় শ্রোতা হলেন মাসিক *মোসলেম ভারত* পত্রিকার আফজাল-উল-হক;

(৫) নজরুল কবিতাটির একটি কপি করে তাঁকে দেন *মোসলেম ভারত*-এ ছাপানোর জন্য;

(৬) পরে কবিতাটির আরেকটি কপি নিয়ে যান অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সাপ্তাহিক *বিজলী* পত্রিকায় ছাপানোর জন্য এবং

(৭) কবিতাটি ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি (১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ, শুক্রবার) *বিজলী*তে প্রথম ছাপা হয়েছিল।

মুজাফ্‌ফর আহমদ আরও জানিয়েছেন যে, আফজাল সাহেব যখন ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কপি নজরুলের কাছ থেকে নেন তখন পৌষ মাস চলছিল আর *মোসলেম ভারত*-এর কার্তিক সংখ্যা তখনও বের হয়নি। এই পত্রিকার কার্তিক সংখ্যা ‘বিদ্রোহী’ কবিতাসহ ফাল্গুন মাসের আগে বের হয়নি। কাজেই ‘বিদ্রোহী’ প্রথম ছাপানোর সম্মান সাপ্তাহিক *বিজলী*রই প্রাপ্য। পৌষ মাসের আগে নজরুল ইসলাম তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনাই করেননি।

কিন্তু, আমরা ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রথম প্রকাশ ও পরবর্তী প্রকাশ সম্পর্কে সাল, তারিখ ও পত্রিকা অনুযায়ী ক্রম ইতিহাসভিত্তিক প্রামাণ্য তথ্য পাই নজরুল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন যে, নজরুলের ‘কামাল পাশা’ ও ‘বিদ্রোহী’ কবিতা ছাপা হয় কলকাতার মাসিক *মোসলেম ভারত* পত্রিকার ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক অর্থাৎ ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায়।

আর সাপ্তাহিক *বিজলী*তে ‘বিদ্রোহী’ ছাপা হয় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ অর্থাৎ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি সংখ্যায়।

‘বিদ্রোহী’ কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয় মাসিক *প্রবাসী*তে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ অর্থাৎ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়।

নজরুল বিশেষজ্ঞ ড. রফিকুল ইসলামের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। তিনি ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি অর্থাৎ ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ তারিখের সাপ্তাহিক *বিজলী*তে প্রকাশিত *মোসলেম ভারত* ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার সমালোচনা উদ্ধার করেছেন। উল্লেখ্য, *মোসলেম ভারত*-এর ঐ সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল নজরুলের দুটি কবিতা ‘কামাল পাশা’ ও ‘বিদ্রোহী’। (*মোসলেম ভারত*, ১৩২৮, কার্তিক, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ১৯২১ সালের নভেম্বর)। *বিজলী*তে ২২শে পৌষ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়:

মোসলেম ভারত, কার্তিক, ১৩২৮, সম্পাদক মোজাম্মেল হক।

'কামাল পাশা' হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা। কবিতাটি যুদ্ধের মার্চের ছন্দে গাঁথা। এরূপ কবিতা বোধ হয় বাংলার কাব্য সাহিত্যে এই প্রথম। 'বিদ্রোহী' কাজী সাহেবের আর একটি কবিতা। কবিতাটি এত সুন্দর হয়েছে যে, আমাদের স্থানাভাব হলেও তা *'বিজলী'*র পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেওয়ার লোভ আমরা সংবরণ করতে পারলাম না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে *মোসলেম ভারত* ('কামাল পাশা' ও 'বিদ্রোহী'সহ)-এর কার্তিক সংখ্যা যদি ফাল্গুন (১৩২৮) মাসে ছাপা হয়ে থাকে, তবে *বিজলী*র পৌষ মাসের ২২ তারিখের (১৩২৮) সংখ্যায় কী করে এর সমালোচনা বের হয়!

প্রকাশের তারিখ দেখে এটা প্রমাণিত হয় যে, 'বিদ্রোহী' প্রথমে *মোসলেম ভারত* পত্রিকাতেই আসলে ছাপা হয়েছিল এবং সেটা ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ (১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি) তারিখের আগে। তবে তা মাঘ বা ফাল্গুন মাসে নয়।

'বিদ্রোহী' যে *মোসলেম ভারত* পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশ ও ছাপা হয়েছিল তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে নজরুল সম্পাদিত *ধূমকেতু*। ১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট অর্ধ সাপ্তাহিক *ধূমকেতু* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার নবম পৃষ্ঠায় 'শানাই-র পোঁর' বিভাগে নজরুলের *'বিদ্রোহী'* কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। পুনর্মুদ্রণকালে কবিতার নিচে ফুটনোটে *ধূমকেতু*র সহকারী সম্পাদক লিখেছেন:

> এই কবিতাটি প্রথমে *মোসলেম ভারত*-এ বের হয়। পরে এটা *বিজলী*, *প্রবাসী* প্রভৃতি পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়। অনেক পাঠক কবিতাটি সম্পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য ঐ সংখ্যার *মোসলেম ভারত* কিনতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন; কেননা ঐ সংখ্যার পত্রিকা-এর বেশি নগদ বিক্রি হয়ে গেছে যে, *মোসলেম ভারত*-এর গ্রাহকগণ ছাড়া এখন আর কাউকেই দেওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্যে অনেকের অনুরোধে আমরা কবিতাটি *'ধূমকেতু'*তে উদ্ধৃত করে দিলাম। প্রার্থনা, কেউ যেন এটা আমাদের ধৃষ্টতা বলে মনে না করেন: সহকারী সম্পাদক।

উল্লেখ্য, *'বিদ্রোহী'* কবিতা পরে নজরুলের *অগ্নিবীণা* (১৯২২) কাব্যগ্রন্থভুক্ত হয়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক তথ্যের আলোকে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম প্রকাশের সাল, তারিখ ও পত্রিকার নাম নিম্নে দেওয়া হলো:

মাসিক মোসলেম ভারত	কার্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২১।
সাপ্তাহিক বিজলী	২২শে পৌষ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ৬ই জানুয়ারি ১৯২২।
মাসিক প্রবাসী	মাঘ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯২২।
অর্ধ সাপ্তাহিক ধূমকেতু	২৬শে শ্রাবণ ১৩২৯, ১১ই আগস্ট ১৯২২।

উপর্যুক্ত তথ্যালোকে এটা প্রমাণিত যে, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি *মোসলেম ভারত* পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। *বিজলী* ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার পরে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল মাত্র।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম প্রকাশ সম্পর্কে আমরা কী মুজাফ্ফর আহমদের *স্মৃতিকথা* (১৯৫৯) সঠিক বলে ধরে নেব নাকি নজরুলের নিজের সম্পাদিত *ধূমকেতু* (১৯২২) পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সময়েরই তথ্য সত্য বলে ধরে নেব?

তিন

'বিদ্রোহী' কবিতার মূল সুর অন্যায়-অবিচার, শোষণ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা এবং সমস্ত অপশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে ধরা।

১৪৬ পঙ্‌ক্তির এই কবিতার ১৪৭ বার 'আমি' শব্দের উল্লেখ আছে। এই 'আমি' হচ্ছে আত্মশক্তি ও আত্মজাগরণ। কবিতার ১৩/১৪টি স্তবকের প্রতিটি স্তবকে রয়েছে কবির বিভিন্ন 'আমি' রূপের বর্ণনা।

প্রথম স্তবকে রয়েছে নিজেকে লক্ষ করে উচ্চারণ:

> বল বীর –
> বল উন্নত মম শির!
> শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!

অতঃপর নিজেকে বিভিন্ন রূপে উপস্থাপন করেছেন নজরুল। চির উন্নত শির, অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল, টর্পেডো, মাইন, ঝঞ্ঝা, ঝড়, ব্যর্থতা, সংহার, সৃষ্টি, বিধবার দীর্ঘশ্বাস, ছায়ানট, হিন্দোল, সন্ন্যাসী, দুর্বাসা, চেঙ্গিস, মহাকল্লোল, উল্কা, উন্মাদ, বিষধর কালফণী, পরশুরামের কুঠার।

এবং অবশেষে লিখেছেন–

> মহাবিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
> আমি সেই দিন হব শান্ত,
> যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
> অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,
> বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
> আমি সেই দিন হব শান্ত।

এভাবেই 'বিদ্রোহী' কবিতার আবেদন শতবর্ষ পেরিয়ে চিরকাল পর্যন্ত টিকে থাকবে।

অনুপম হায়াৎ: চলচ্চিত্র গবেষক ও শিক্ষক

'বীর মুক্তিযোদ্ধা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ নির্ধারণ

'বীর মুক্তিযোদ্ধা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ নির্ধারণ করল সরকার। 'বীর মুক্তিযোদ্ধা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Heroic Freedom fighter (হিরোইক ফ্রিডম ফাইটার)' নির্ধারণ করে দিয়ে ১৭ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পরে সেটির গেজেট জারি করা হয়। গেজেটে বলা হয়, 'বীর মুক্তিযোদ্ধা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Heroic Freedom fighter' ব্যবহার করতে হবে।

সবক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের নামের আগে 'বীর' শব্দ ব্যবহারের বিধান করে গত বছরের অক্টোবরে গেজেট প্রকাশ করে সরকার। ওই গেজেটে বলা হয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮'-এর ধারা ২(১১)-এ মুক্তিযোদ্ধাদের 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ওই আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং একাদশ জাতীয় সংসদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে বীর শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

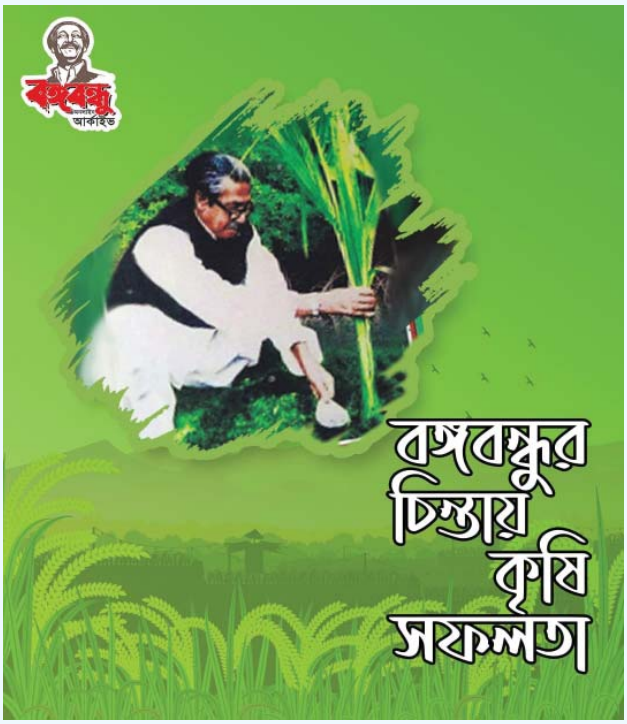

কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু

সুস্মিতা চৌধুরী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, সাধনা, রাজনীতি ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়। সর্বোপরি বিশ্বে বাঙালিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের পথ প্রদর্শক। তিনি শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এজন্য সারা জীবন জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন, তাঁকে এমনকি ফাঁসির মঞ্চও তাঁর লক্ষ্য থেকে একচুলও সরাতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু বাল্যকাল থেকেই যেখানে অনিয়ম দেখেছেন, বৈষম্য ও শোষণ দেখেছেন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মানুষ যেখানে বঞ্চিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে সেই জায়গায় নিজের ভূমিকা নিয়ে হাজির হয়েছেন। ভেবেছেন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। যে কারণে সেসময়ে তিনি প্রান্তিক কৃষক, কৃষি শ্রমিক, খেতমজুর সবার পক্ষেই কাজ করেছেন। তিনি নিশ্চিত হন কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি ছাড়া বাঙালি জাতির মুক্তি নেই।

১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর পর বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন তাতে কৃষকের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই কৃষকের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হবে। আর ১০ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। অর্থাৎ সকলের খাজনা মাফ করে দেওয়া হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায়ও এই একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'। ঐ সমাবেশে তিনি আরও বলেন, 'আইয়ুবী আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাসজমিগুলো বণ্টন করা হয়েছে ভুড়িওয়ালাদের কাছে। তদন্ত করে এদের কাছ থেকে খাসজমি কেড়ে নিয়ে তা বণ্টন করা হবে বাস্তুহারাদের মধ্যে। চর এলাকায়ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি কৃষক ও শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি– আওয়ামী লীগ তাদের আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ও আন্দোলন ছিল কৃষিজীবী মানুষের জন্য। তিনি স্বপ্নও দেখেছিলেন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির। সেভাবেই সূচনা করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজ। বঙ্গবন্ধু গভীর চিত্তে উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন কৃষি ও কৃষকের সামগ্রিক উন্নতি। ১৯৭২ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল এক কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন। সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য এ খাদ্য পর্যাপ্ত ছিল না। খাদ্য ঘাটতি সংকুলানে বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীনতার পর দুই বছর খাদ্যে ভরতুকি প্রদান করেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি সেচ সুবিধায় বেশি বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল। তার মধ্যে ১০১ কোটি টাকা শুধু কৃষি উন্নয়নের জন্য রাখা হয়েছিল। ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে সেচে বরাদ্দ ছিল ৩০ কোটি ৬৬ লাখ, শস্য উৎপাদনে ৩০ কোটি ২১ লাখ ৯০ হাজার টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষিতে বরাদ্দ ছিল মোট এডিপি'র ১৩.১৪%– যা সময়ের প্রেক্ষাপটে ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

বঙ্গবন্ধু কৃষকবান্ধব। কৃষকের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি স্বল্পমেয়াদে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করেন এবং কৃষকের কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাসজমি বিতরণ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে কৃষকদের সবরকম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষিদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।' তিনি কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্যে প্রথমে দেশে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। একইসঙ্গে উন্নত বীজ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেন, উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি বলেন, 'আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না... জমিতে যেতে হবে, দ্বিগুণ ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন আজ থেকে ঐ শহিদদের কথা স্মরণ করে দ্বিগুণ ফসল করতে হবে। যদি দ্বিগুণ ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না।' ১৯৭৫ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁর জীবনের সর্বশেষ জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

কৃষির উন্নয়নে কৃষি গবেষণার বিকল্প নেই– এ সত্য উপলব্ধি থেকেই ১৯৭৩ সালে কৃষিতে গবেষণা সমন্বয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। ১৯৭৩ সালে ১০ নম্বর অ্যাক্টের মাধ্যমে নতুন নামে পুনর্গঠন

করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দান করেন।

প্রসঙ্গত ১৯৭৩ সালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩০০০টি অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭২ সালে জরুরিভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ১৬,১২৫ টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাটবীজ ও ১০৩৭ টন গমবীজ সরবরাহ করা হয়। পাকিস্তানি শাসনকালে রুজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেওয়া হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরদিনের জন্য রহিত করা হয়। আগের সমস্ত বকেয়া খাজনাও মাফ করা হয়। ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেধে দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। ঐ সময় দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। বিরাজমান খাসজমির সাথে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণযোগ্য জমির সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমিয়ে এনে পরিবার পিছু জমির সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করে দেন। ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে ১১ হাজার শক্তিচালিত পাম্পের স্থলে ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে এই সংখ্যা ৩৬ হাজারে উন্নীত করা হয়। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লাখ একরে উন্নীত হয়। বিশ্ববাজারে রাসায়নিক সারের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির কারণে সারে ভরতুকি দিয়ে কৃষককে রক্ষা করেন বঙ্গবন্ধু।

শিক্ষিত মানুষকে গ্রামমুখী এবং কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে প্যান্ট, কোট ছেড়ে মাঠে না নামলে বিপ্লব করা যাবে না, তা যতই লেখাপড়া করা যাক, তাতে কোনো লাভ হবে না। আপনাদের কোট-প্যান্ট খুলে একটু গ্রামে যেতে হবে।' জাতির পিতার এসব সচেতন ও কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তারই ফলে আজ কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। বর্তমান সরকার যে কল্যাণধর্মী ও কৃষকবান্ধব উন্নয়ন নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে তা বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনারই প্রতিফলন।

কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য দরকার কৃষকের নিজস্ব জমির ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনের সময় কম দামে কৃষকদের সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য দেওয়া, পচনশীল ফসল সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কম দামে সেচযন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এসব কিছুরই সূচনা করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মূলত কৃষক ও কৃষির উন্নতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের কল্যাণ। কৃষির মধ্যে নিহিত রয়েছে দেশের সমৃদ্ধি। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণে কৃষি ও কৃষকের প্রতি তাঁর যে হৃদয়ের গভীর টান ছিল সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে– '৯০ শতাংশ কৃষক গ্রামে বাস করে। গ্রামের দিকে যেতে হবে। আমার ইকোনমি যদি গণমুখী করতে না পারি এবং গ্রামের দিকে যদি না যাওয়া যায়, সমাজতন্ত্র কায়েম হবে না, কৃষিবিপ্লব হবে না।'

কৃষি ও কৃষকের প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর মমত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। সেজন্যই তিনি সবসময় দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গঠনে কৃষি ও কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষিবিদদের কল্যাণে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোটা কৃষি ব্যবস্থাকে ব্যাপক আধুনিকীকরণ ও লাগসই উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতা কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, সমবায়সহ সব উন্নয়ন চিন্তার সফল বাস্তবায়নে গ্রহণ করেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব' কর্মসূচি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামগ্রিক দর্শনের ভিত্তি ছিল– আপামর জনমানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা। উন্নয়ন দর্শনে তাই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন সমবায়কে। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। গ্রামে গ্রামে গণমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রাম্য অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চেয়েছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাসমৃদ্ধ তা দেখা যায় ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন বাংলাদেশের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই আমার স্বপ্ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে'।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রকৃত অর্থে বঙ্গবন্ধুর সমবায় বাংলার-ই প্রতিচ্ছবি। তাইতো স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কৃষিতে সমবায় ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কৃষি সমবায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের আর্থসামাজিক কারণে দেশে দিন দিন জমির বিভাজন বেড়ে চলেছে। যদি সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলা না যায় তাহলে আমাদের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হবে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারব না। আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ব। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে আগাতে পারলে আমাদের কৃষির উৎপাদন এবং সার্বিক উন্নয়ন দুটিই মাত্রা পাবে, সমৃদ্ধ হবে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের চিরচেনা কৃষির পথপ্রদর্শক। বঙ্গবন্ধুর পথ, তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ অনুসরণেই কৃষকের উন্নয়ন ও কৃষির উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধু কৃষি ও কৃষক তথা আপামর জনগণের মুক্তির জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আবহমান বাংলার একজন পথচারী। বাংলার মাটির সাধারণ মানুষ। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু তাঁর এক বাণীতে বলেন, 'বাংলার অর্থনীতি হবে গ্রামীণ অর্থনীতি। গ্রামকে বাঁচাতে হবে, গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে হবে, কৃষক বাঁচাতে হবে– তাহলেই সোনার বাংলা গঠন হবে'।

সুস্মিতা চৌধুরী: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

সেদিন দশই জানুয়ারি

রফিকুর রশীদ

সেদিনও ছিল জানুয়ারির দশ তারিখ।

কে না জানে, বাঙালির জীবনে এবং বাংলার ইতিহাসে এই তারিখটির রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। উনিশশো বাহাত্তরের এই দিনে পাকিস্তানের কারাগারে দীর্ঘদিন বন্দি থাকার পর বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বদেশের রক্তভেজা মাটিতে এবং দেশবাসীর বুকভরা ভালোবাসার মাঝে ফিরে আসেন, ষোলোই ডিসেম্বরে অর্জিত বিজয় পূর্ণতা লাভ করে, বিজয়ী বাঙালি এবং সচেতন বিশ্ববিবেকের উৎকণ্ঠার অবসান হয়। ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে আসার এই অবিনাশী দিন তো ফি-বছরই ঘুরে ফিরে আসে এবং বাহাত্তরের সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটিকে স্মরণ করিয়েও দেয়। কিন্তু এই তারিখের সারাটা দিনে অসংখ্য জন্ম-মৃত্যুসহ আরও যতসব সামান্য-অসামান্য ঘটনা ঘটে, তার সবগুলোকেই কি 'কাকতালীয় সাদৃশ্য' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। এই যে রত্নেশ্বর উপজেলার অধ্যাপক আক্তারুজ্জামানের একমাত্র পুত্র হাসান আক্তার দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রবাসজীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে এল এ বছরের দশই জানুয়ারি, বাহাত্তরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে এর কী বা সম্পর্ক! হাসান আক্তার এসেছে ছুটি কাটাতে, ছুটি শেষে আবার সে ফিরে যাবে বিদেশের কর্মস্থলে। তাহলে একে কি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বলা চলে! কোথায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, আর কোথায় বা হাসান আক্তারের বাড়ি ফেরা!

হাসান আক্তার পেশায় প্রকৌশলী। এ পেশার অধিকাংশ মানুষজন পা বাড়িয়েই থাকে বিদেশ পানে। লেখাপড়ার পাট শেষ হতে না হতে ছোটাছুটির হিড়িক পড়ে যায় বাইরে যাবার জন্যে– চাকরি নিয়েই হোক অথবা বৃত্তিটিত্তি জুটিয়েই হোক, দেশ ছেড়ে যেতে পারলেই যেন তাদের স্বর্গে যাওয়া হয়। হাসানের ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিল না। জন্মভূমিকে সে স্বর্গের চেয়ে কম কিছু ভাবতে শেখেনি। শৈশবে বাবার কাছেই শিখেছে– স্বর্গাদপী গরীয়সী...। বাবার কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়া পর্যন্ত এলাকার ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র হিসেবে সবার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ তার বাবার রাজনৈতিক দর্শনের লেবেল তার গায়ে সেঁটে দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করতেও চেয়েছে, সেটুকু সে দিব্যি টের পায়। এ নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না, এমনকি বাবার সঙ্গে তর্ক করতেও ইচ্ছে করে না। এমনিতে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ, বলা যায় বাবার উষ্ণ সান্নিধ্যের কারণে এক প্রকার রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্য দিয়েই তার বেড়ে ওঠা। তাই বলে বাবার আদর্শের ছায়া সিলমোহর হয়ে লেপটে থাকুক কপালে, এটা সে কখনো চায়নি। বুয়েটে ভর্তি হবার পর সত্যি সত্যি সে রাজনীতি-সক্রিয় হয়ে উঠলে বাবা চমকে ওঠেন, ছেলের মুখের মানচিত্রে কী যেন অস্পষ্ট আঁকিবুকি খুঁজে খুঁজে হয়রান হন। অবশেষে একদিন দীর্ঘশ্বাসমর্থিত কণ্ঠে বলেই ফেলেন–'তুমিও তাহলে জয় বাংলায় ভিড়ে গেলে হাসান আক্তার!'

ভিড়ে যাওয়া তো শুধু নয়, সে বাধভাঙা উচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজনীতির ঘূর্ণিস্রোতে। রত্নেশ্বরে বাবার উপস্থিতি মানেই ছিল এক দৃশ্যাতীত বাধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পর সেই বাধ টপকাতে আর সময় লাগে না, খড়কুটো হয়ে স্রোতে ভেসে যায় সব কিছু। দু'চার মাসের ব্যবধানে বাড়ি এলে বাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে সামান্য একটু দ্বিধা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু বাবা কখনোই চড়াগলায় কথা বলেননি এ নিয়ে। অন্য সব অভিভাবকের মতোই পুত্রের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেওয়া পর্যন্ত কৌতূহল দেখিয়েছেন, চারদিকে চোখকান খোলা রাখতে বলেছেন, কখনোবা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পারুলের কথা– 'তোমার একটা ছোটোবোন আছে, সেটা যেন ভুলে যেয়ো না খোকা!'

পারুল আক্তার হাসানের চেয়ে দশ বছরের ছোটো। হাসান আক্তার

যে বছরে বুয়েটে ভর্তি হয়, পারুল সে বছর প্রাথমিক বৃত্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে, অঙ্ক-ইংরেজির জাহাজ; এত আদরের বোনটির কথা সে ভুলে যাবে কেন! আর এমন একটি কথা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজনই বা কী, এই সহজ কথাটির আড়ালে অব্যক্ত কোনো তাৎপর্য আছে কি না সেসব কখনো ভেবে দেখেনি হাসান আক্তার। ছোটোবোনের চোখের তারায় চোখ রেখে তামাশা করেছে– তোকে ভালো করে দেখতে বলেছে বাবা। হুঁ।

পারুল কিছু না বুঝেই যেন লজ্জা পেয়েছে খুব।

হাসান আক্তারের বিদেশযাত্রা ছিল একটু অন্যরকম। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে সে খুব কাছ থেকে দেখেছে– কে কীভাবে বিদেশে পাড়ি জমায়। ইঞ্জিনিয়ার হয়েও একজন মানুষ একটা স্কলারশিপের জন্যে কতটা লালায়িত হয়ে উঠতে পারে, তা বাইরে থেকে বুঝা যায় না। ঘৃণ্য এই লালা ঝরানো লোভের চিত্র খুব ভালোভাবে সে দেখেছে এবং নিজেকে শাসিয়ে রেখেছে– এমন দুর্মতি যেন তার সহসা না হয়। দেশ ছাড়তে সে চায়নি। 'মায়ের-ভাইয়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ'–এ তার প্রাণের গভীরে মর্মরিত বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি প্রগাঢ় মমতা দুধের সরের মতো নিবিড় প্রলেপ বিছিয়ে দিয়েছে বুকের জমিনে। আজন্মের চেনা-জানা এই চরাচর ছেড়ে সে বাইরে যাবে কেন?

অসুস্থ রাজনীতির বিষাক্ত ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে হাসানকে এই শেকড়-উপড়ানো সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নির্বাচনের পর বিজয়ী দল যতটা বেপরোয়া এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে তাতে দেশের মাটিতে টিকে থাকা তার জন্যে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। শিবিরের লাল তালিকায় নাম উঠেছে অনেক আগেই, নাস্তিক-মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে হাত-পায়ের রগ কাটার জন্যে তারা তড়পে বেড়াচ্ছে অনেকদিন থেকেই; এবার অনুকূল আলো-হাওয়ায় কোপ বসানোর সুযোগ পেলেই তা তারা ছাড়বে কেন! প্রথম আঘাতেই সাতদিনের হাসপাতালবাস। তারপর অতিশয় স্নেহপ্রবণ এক শিক্ষকের প্রেরণা এবং প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে বিদেশ গমনের সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে হাসান বাড়ি আসে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে। আশৈশবের পরিচিত রত্নেশ্বর, এই জনপদের ধুলোমাটি মেখে বেড়ে ওঠা, এই প্রকৃতির রোদ-বৃষ্টি এখনো তার বুকের মধ্যে গন্ধ ছড়ায়; তবু সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে ঢাকা কোচ থেকে নেমে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতে হাসানের গা ছমছম করে, বুক ঢিপঢিপ করে, পায়ের গতি শ্লথ হয়ে আসে। বিপন্ন হাতে দরজার কড়া নাড়ে, কণ্ঠ ফেঁড়ে ডেকে ওঠে– মা!

স্নেহে আর্দ্র মায়ের বুকের মধ্যে ছোট্ট শিশুটি হয়ে যায় হাসান আক্তার, ছোটোবোন পারুল আক্তার এসে ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে, অব্যাখ্যেয় আবেগ এসে কণ্ঠরোধ করে দাঁড়ায় হাসানের। স্ফুট কোনো কণ্ঠস্বরে নয়, নীরব অশ্রুধারায় চলে তাদের জানাজানি, এতদিনের জমিয়ে রাখা কথার বরফ গলে গলে নেমে আসে চোখের জলে। কিন্তু এই হাসানকেই খানিক রাত হবার পর বরফ জমাট পাহাড়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। হ্যাঁ, পাহাড়ই তো! অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান তার পিতা, ক্লাসঘরের শিক্ষক, আবার সুউচ্চ এক পাহাড়ও বটে। আরও অনেক বাবার মতো এই মানুষটিও আদর করে শিশুপুত্রকে কাঁধে তুলেছেন, কৈশোরে তার হাত ধরে নদীতীরে হেঁটে বেড়িয়েছেন, তারুণ্যের উচ্ছল দিনে বন্ধুর মতো সঙ্গ দিয়েছেন; পিতা-পুত্রের কত কথা তর্কবিতর্ক; বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর হাসানের তবু মনে হয়েছে– নাহ্, পাহাড় চূড়া যেনবা স্পর্শের বাইরেই রয়ে গেল। অতিমাত্রায় রাজনীতি-সক্রিয় হয়ে ওঠার পরও সে পরখ করে দেখেছে পাহাড়ের গায়ে কোনো ফাটল ধরেনি, তবে পাহাড় চূড়ার দূরত্ব বেড়েছে।

সেই পাহাড়ের সঙ্গে দেখা রাতেরবেলা। হাসান অবাক হয়ে তাকায়, একটুখানি হতাশ হয়– কোথায় সেই 'উন্নত মম শির!' বাবার খুব প্রিয় কবিতা নজরুলের 'বিদ্রোহী'। কী যে অবিচল দৃঢ়তায় উচ্চারণ করেন– 'আমারই নত শির এই শিখর হিমাদ্রির!' বাবার চোখে চোখ পড়তেই সংশয় জাগে হাসানের– পাহাড়ে কি ধস নেমেছে এতদিনে! মাথার পাতলা চুল উসকো-খুসকো। কদম ফুলের মতো ফুটে বেরিয়েছে বেশ কদিনের না-কাটা দাড়ি। বিষণ্ন কণ্ঠে তিনি জানান, ভোটভাটের মধ্যে বাড়ি না এসে ভালোই করেছ।

হাসান চমকে ওঠে। কিন্তু বুঝতে পারে না– এখন এ কথার অর্থ কী! নির্বাচনি হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লে অমঙ্গল হবার আশঙ্কার কথা ভেবে তিনি হাসানকে বাড়ি আসতে নিষেধ করেছিলেন। তবু তো নির্বাচনের সহিংসতার ছোবল থেকে সে রক্ষা পায়নি। শুধু এই রত্নেশ্বর উপজেলা নয়, নির্বাচনের আগে এবং পরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলেছে প্রতিহিংসার তাণ্ডব। দেশের চলমান রাজনৈতিক টালমাটাল পারস্থিতি নিয়ে পিতা-পুত্রের বিস্তর আলোচনা চলে গভীর রাত পর্যন্ত। এক পর্যায়ে অধ্যাপক আক্তারুজ্জামানের কণ্ঠ থেকে দীর্ঘশ্বাসের গা পেঁচিয়ে বেরিয়ে আসে ভয়ানক এক তথ্য। স্থানীয় কলেজে অধ্যক্ষের মাথার উপর থেকে টেনে হিঁচড়ে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানোর সময় মৃদু আপত্তি জানানোর কারণে তাকে ঢের অপমানিত হতে হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের আর দোষ দেবেন কী, সহকর্মীদের মধ্যেও অনেকে অনেক রকম কটাক্ষ করেছেন নিষ্ঠুরভাবে। অধ্যক্ষ সাহেব পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন– জামান সাহেব তো ছিলেন কম্যুনিস্ট, ইদানীং রং বদলেছেন নাকি?

প্রিন্সিপালের পোঁ ধরা চাটুকারেরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। জামাত নেতা ইদ্রিস মোল্লা হুল ফুটিয়ে মনে করিয়ে দেন– জামান স্যারের ছেলে হাসানের কথা মনে নেই স্যার? আমাদের ছাত্র ছিল ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। সে তো এখন বুয়েটের বড়ো লিডার!

মুখে হলাহল নিয়ে উগরে দিতে এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মোহাম্মদ আলী জিনাহ। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি বলে– ছেলেকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে জামান ভাই আর কম্যু সেজে থাকবেন কদ্দিন? ওই ছবির উপরে দরদ তো হবেই তার।

সহকর্মীদের পরিহাসের চাবুকে রক্তাক্ত হয়ে সেদিন অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান কী বলেছিলেন কে জানে, তবে তিনি নিজ বাড়িতে মধ্যরাতে একমাত্র পুত্র হাসান আক্তারকে বুঝাতে চেষ্টা করেন– এই সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবি ওঠানো-নামানোর কোনোটিই আমি সাপোর্ট করি না, সে তো তুমি জানোই। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম– এভাবে টানাহ্যাঁচড়া করে ছবি নামানো...

হাসান আক্তারের কানে যেন আর কোনো কথা ঢোকে না, বাবার মুখ থেকে দৃষ্টি সরে গিয়ে আছড়ে পড়ে ড্রয়িংরুমের দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ছবিতে। দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় প্রিয় নেতার শাহাদত অঙ্গুলির ডগায়। এ জীবনে বঙ্গবন্ধুর যত ছবি সে দেখেছে তার মধ্যে এই একটি ছবি তার সবচেয়ে প্রিয়। ঢাকা থেকে এই ছবিটি বাড়িতে এনে যেদিন সে ড্রয়িংরুমে টাঙাতে উদ্যত হয়, সেদিনও তার বাবা বিরূপ যুক্তি তুলে ধরেন– এটা তো পার্টি অফিস নয়রে বাবা, এটা আমাদের বাড়ি, বসবাসের জায়গা।

হাসান যে কোথায় এত জোর পায় কে জানে, বাবার মুখের উপরে সেদিন ঘোষণা করে,

শুধু রাজনীতি নয় বাবা, এটা ইতিহাসের ছবি।

বাবা নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন। ছেলে বলে,

ইতিহাসের বাঁক বদলের ছবি এটা। তুমি নাকি সাতই মার্চের সেই

জনসভায় ছিলে বাবা! বাঙালির এমন ঐক্য নাকি আগে কখনো দেখা যায়নি। তুমিই তো বলেছ!

একাত্তরের সাতই মার্চ হাসান দেখেনি। তবু তার মুখে সেদিনের ব্যাখ্যা শুনতে ভালোই লাগে। অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান ইতিহাসের বাঁকবদলের গল্প শোনেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে– এখান থেকেই তো নতুন লক্ষ্যে বাঙালির যাত্রা শুরু, এই সাতই মার্চ থেকে। যার সাতই মার্চ নেই, তার আবার ছাব্বিশে মার্চ কীসের, ষোলোই ডিসেম্বর কীসের বাবা?

বাবা নিরুত্তর। এমন প্রশ্নের ঘাই তার চেতনা অবশ করে দেয়। পুত্রের যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান, স্মৃতি হাতড়ে সমর্থন খোঁজেন– বঙ্গবন্ধু কি সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন? অথচ লাখো জনতার অন্তরে সেদিন ফুটেছিল ওই একটি আকাঙ্ক্ষার অগ্নিকুসুম। সেই কুসুমের ঘ্রাণ থেকে কেউ নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে! বঙ্গবন্ধুর নামেই ফুটেছে যে কুসুমকলি, তার সৌন্দর্য এবং উত্তাপ থেকে মুখ ফেরানোর সাধ্য কি তার ছিল? নাহ্, তিনি যে বললেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ...।

একাত্তরের আক্তারুজ্জামান ক্লাস সেভেন-পড়ুয়া কিশোর বই তো নয়! ঢাকাবাসী বড়ো মামার বাসায় আটকে পড়ার সুবাদে রেসকোর্সে যাওয়া, দিলুভাইয়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্লোগানও দিয়েছে– তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব/তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি। কিন্তু সেদিনের মঞ্চ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি তাদের। শোনাও হয়নি পুরো ভাষণ। কিন্তু 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– সে কি ভোলা যায়! তারপর মামাতো ভাই দিলু, আক্তারুজ্জামানকে ফাঁকি দিয়ে তাদেরই বাড়ি থেকে যুদ্ধে গেছে, শহিদ হয়েছে; কিন্তু সাতই মার্চের সেই স্মৃতি কি ভোলা যায়! দিলু ভাইয়ের মুখ মনে পড়ায় দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে, রক্ষীবাহিনীর তাড়া খাওয়া স্মৃতি পিছু হটে যায়; এত বছর পর আপন সন্তানের সঙ্গেও আর কোনো তর্কে জড়াবার প্রবৃত্তি হয় না। চাদরের কোণায় চোখ মুছতে মুছতে ড্রয়িংরুম ছেড়ে বেরিয়ে আসেন অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান।

সাতই মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণেরও বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন ছবি দেখার সুযোগ হয়েছে হাসান আক্তারের। তার মধ্যে দুটো ছবিকে সে আলাদা করে বাছাই করেছে। একটিকে বঙ্গবন্ধুর মুখাবয়বই মুখ্য, কালো ফ্রেমের চশমা, মাথার চুলে ব্যাকব্রাশ, সাদা পাঞ্জাবির আস্তিন ঝুলে আছে, আকাশ ছোঁয়া আঙুল উঁচিয়ে ধরা এবং কলরেডি মাইক্রোফোনের লোগো স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। অপর ছবিটিতে বঙ্গবন্ধুর মুখের অভিব্যক্তি বুঝার উপায় নেই বললেই চলে, সেখানে রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত লাখো জনতার উদ্বেগ-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের অভিব্যক্তিই মুখ্য; বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলা হয়েছে পেছন থেকে, এখানেও আছে সেই অঙ্গুলি-নির্দেশ। এই দ্বিতীয় ছবিটিই হাসানের অধিক পছন্দ। দুটো ছবি পাশাপাশি রেখে তুলনা করে দেখেছে, একটির চেয়ে অন্যটি কেন বেশি প্রিয় সেটা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে। কেটেকুটে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছে। শেষটিতে জনগণের অভিব্যক্তি মুখ্য বলেই বুঝিবা হাসানের পক্ষপাত এইদিকে। হাসান আক্তার সাতই মার্চের এই ছবিটি বাঁধিয়ে এনে নিজেদের বাড়িতে সযত্নে টাঙিয়ে রেখেছে সেই কবে! এ নিয়ে বাবার সঙ্গে দু'কথার তর্কাতর্কি যা হয়েছে তা একেবারেই শুরুতেই হয়ে গেছে, নির্বাচনোত্তর সহিংসতার মধ্যে অফিস-আদালত থেকে যখন ছবি নামানোর উৎসব চলছে এবং কলেজে এই ছবি নামানোকে কেন্দ্র করে বাবার অপমানের কথা জানার পরও হাসান নিজেদের বাড়িতে টাঙিয়ে রাখা ছবিটি নিয়ে কিছুই বলতে পারেনি তারা বাবাকে। দেশ ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে যে, বয়স হয়েছে বাবার, ওই ছবির জন্যে আবার যদি কেউ বাড়িতে এসে তাকে অপমান করে, তখন কে দাঁড়াবে পাশে! খুব দুর্ভাবনা হয়েছে হাসানের, বঙ্গবন্ধুর ছবির মধ্যে 'উন্নত মম শির' খুঁজে পাবার পর বাবাকে আর কিছুই বলতে পারেনি। এমনকি একটু সাবধানে থাকার পরামর্শও সে উচ্চারণ করতে পারেনি। ড্রয়িংরুমের দেয়াল থেকে বঙ্গবন্ধু নীরবে আশীর্বাদ জানিয়েছেন, হাসান আক্তার মায়ের-বোনের অশ্রুজলের উষ্ণ স্পর্শে সিক্ত হয়ে বিদায় নিয়েছে বাড়ি থেকে, পাড়ি জমিয়েছে বিদেশে। উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন, চাকরি লাভ, এমনকি প্রবাসী এক বাঙালি মেয়েকে তার পছন্দের কথাও সে জানিয়েছে বাড়িতে। ছোটোবোন পারুলের বিয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার সে একাই বহন করবে, সে ইচ্ছাও সানন্দে জানিয়ে রেখেছে।

এত বছর পর ঢাকায় পৌঁছে হাসান আক্তার একটুও বিলম্ব করেনি। বুক ভরে দেশের বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণের পরই সোজা রত্নেশ্বরের বাস ধরেছে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই সে বাড়ির দুয়ারে পৌঁছুতে চায়, মায়ের মুখ দেখতে চায়। ঢাকার পথে নেমেই চমকে ওঠে– আজ দশই জানুয়ারি! তারিখ তার মাথাতেই ছিল, কিন্তু এটা যে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এই কথাটাই আগে মনে পড়েনি। এমন অসাধারণ এক শুভদিনে সেও বাড়ি ফিরছে। সাদৃশ্যটুকু কাকতালীয়ই বটে, তবু তার সারা দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। আহা, এমন দিনে তার মায়ের কাছে যাওয়া, রত্নেশ্বরের মাটিতে পা রাখা! অন্যরকম শিহরণ জাগে অন্তরে-ভেতরে। বাইরে কী যে অনির্বচনীয় আনন্দ-অনুভূতি! এই এক শিহরণ সারা পথ তাকে জাগিয়ে রাখে। ভ্রমণ-ক্লান্তিতে একবারও চোখ বুজে আসে না। কিন্তু দিনের শেষে বাস থেকে নেমে রত্নেশ্বরের মাটিতে পা দিতেই সহসা এক আঁজলা সংকোচ এসে তাকে বিহ্বল করে তোলে– সারাদিন এ কী যা-তা ভাবছে সে! এই অপরিকল্পিত সাদৃশ্যটুকু কারও নজরে না পড়লেই ভালো। তার আনন্দ এবং লজ্জা একান্ত তার বুকের গভীরেই লুকানো থাক। কিন্তু তার বাবা অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান এতটা বিস্মৃত হবেন! যদিবা মেঘের আড়াল থেকে তৃতীয়ার ক্ষীণকায় চাঁদের মতো উঁকি দেয় কাকতালীয় এই সাদৃশ্য!

বাসস্ট্যান্ড থেকে হাসান আক্তারের রিকশা এসে থামে বাড়ির সামনে।

ভাড়া মিটিয়ে রিকশা থেকে নামতে নামতে হাসান এদিক-ওদিকে তাকায়। নাহ্, সেই নারিকেল গাছে ঘেরা ছায়াশীতল বাড়িই বটে। তবু এত অচেনা মনে হচ্ছে কেন! রিটায়ারমেন্টের পর পেনশনের টাকায় বাবা বাড়িটাকে দোতলা করেছেন– একথা তার অজানা নয়। মফস্বল শহরের ছিমছাম দোতলা একটা বাড়ির স্বপ্ন ছিল বাবার। সেই স্বপ্ন নিজের উপার্জিত অর্থে বাস্তবায়ন করতে পারায় তিনি খুব তৃপ্ত। প্রকৌশলী পুত্রের অর্থে নয়, এমনকি প্ল্যান-ডিজাইনও তিনি নেননি, এতেই তার প্রবল আনন্দ। সেই আনন্দসংবাদ প্রবাসীপুত্রকে যথাসময়েই জানানো হয়েছে। হাসান অবাক বিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করে– এই তাহলে সেই স্বপ্নের বাড়ি!

বাড়ির সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় হাসান। নুয়ে পড়া বাগান-বিলাসের লতা বাম হাতে একটুখানি সরাতেই চোখে পড়ে ছোট্ট একটি নেম প্লেট– মেঘনীল। এটাই তবে বাড়ির নাম! খুব রোমান্টিক নাম তো! আশ্চর্য ব্যাপার, এমন সুন্দর একটা নামের কথা পারুলও একবার বলবে না! অভিমান উথলে উঠতে গিয়েও মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়।

সহসা দুটি অচেনা শিশু এগিয়ে আসে। হাসানের পাশ গলিয়ে দিব্যি ঢুকে পড়ে সিঁড়িঘরে। হয়তোবা নিচতলার বাসিন্দা ওরা। বেশ মনে পড়ছে, নিঃসঙ্গ অবস্থা কাটাতে নিচে ভাড়াটে তোলা হয়েছে, এ খবর মা তাকে জানিয়েছে। শিশু দুটি হাসানের দিকে তাকিয়ে ফিকফিক

করে হাসে। হাসান ওদের গালে হাত বুলিয়ে আদর করে, ইচ্ছে করে শুধায়– এটা কাদের বাড়ি বলো তো!

পারুল আন্টিদের বাড়ি।

ও আচ্ছা!

হাসান সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উদ্যত হয়, পা বাড়ায়, একটি শিশু বলে ওঠে, পারুল আন্টি তো নেই।

কথাটা সে কানে তোলে না। তরতর করে উপরে উঠে যায়। দরজায় দ্রুত হাতে নক করতে গিয়ে হাতের আঙুল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দৃষ্টি চলে যায় দরজার চৌকাঠের উপরে। এখানে কেন বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের ছবি। একদা ছিল ড্রয়িংরুমের দেয়ালে, তাই নিয়ে বাবার কত উদ্বেগ, এখন সেই ছবি কি প্রমোশন পেয়ে চলে এসেছে প্রকাশ্যে! দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুফল তাহলে অধ্যাপক আক্তারুজ্জামানের বাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছে! বাহ্, এ যে ভারি সুসংবাদ বটে। আনন্দের আতিশয্যে সে মা বলে ডেকে ওঠে। কিন্তু দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন তার বাবা। ঝড়ে ভেঙে পড়া কলাগাছ যেন। ছিন্ন ভিন্ন পত্ররাজি। বাবার বিধ্বস্ত মুখ থেকে হাসানের দৃষ্টি সরে যায় বঙ্গবন্ধুর ছবির দিকে। বাবা সেটা ধরতে পারেন। ছেলের কাঁধে বন্ধুর মতো হাত রেখে তিনি বলেন,

সাতই মার্চের ছবি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখব কেন? বাইরে, প্রকাশ্যে এনে রেখেছি।

হাসান এক কথায় মেনে নেয়,

বেশ করেছ বাবা। মা কই? পারুল কই?

ভেতরে আসবি তো! ঠিক কথাই বলেছিস তুই– যার সাতই মার্চ নেই, তার আবার ছাব্বিশে মার্চ কীসের? ষোলোই ডিসেম্বর কীসের? এ বাড়িতে ঢুকতে হলে...

বাবার কথার শেষটুকু না শুনেই হাসান ভেতরে ঢুকে পড়ে। চিৎকার করে ডাকে– মা।

সামনে দাঁড়িয়ে বাবা বুঝাতে চেষ্টা করেন,

তোর মায়ের একটু অসুখ করেছে। দেখবি চল।

হাসানের মা যে ঘরে থাকে সেখানে এসে তিনি বলেন, আজকের তারিখ মনে আছে হাসানের মা! জানুয়ারির দশ। আমাদের খোকাও আজ ঘরে ফিরেছে।

বাবার এতসব নাটকীয়তার তোয়াক্কা না করে হাসান ঘরে ঢুকেই মায়ের বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মায়ের কাঁধের তলে দু'হাত চালিয়ে সে প্রবল ঝাঁকুনি দেয় এবং আর্তনাদ করে মা বলে ডাকে। কিন্তু মায়ের কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা যায় না। চলৎ শক্তিহীন মানবপিণ্ড পড়ে আছে নির্বাক নিস্পন্দ। চোখের পাতাও নিষ্পলক, খোলা পড়ে আছে। সেই দুটি চোখ একমাত্র পুত্রের আগমনে একটুও নেচে ওঠে না। পুত্র তখন কী করে! মাকে ছেড়ে এবার সে বাবার মুখোমুখি হয়, জিজ্ঞাসা করে–

মায়ের এ কী অবস্থা বাবা?

কেমন যেন অপরাধীর গলায় বাবা বলেন,

এই তো সেদিন হঠাৎ, কী বার যেন ... ও হ্যাঁ, শনিবার বিকেলে হঠাৎ ...

পারুল কই! পারুলকে দেখছি না যে!

সহসা কী যে অঘটন ঘটে যায়, অধ্যাপক আক্তারুজ্জামানের মতো একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ পুত্রের কাঁধে দুহাত রেখে ডুকরে ওঠেন,

সেই হতভাগীর জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ! শনিবার বিকেলেই তো অঘটনটা ঘটে গেল! কলেজ থেকে ফিরল না।

কী বলছ বাবা! গেল কোথায় সে?

অধ্যাপক আক্তারুজ্জামানের সারা মুখে অন্ধকার নেমে আসে। গ্লানির অমোচনীয় কালিমা ছেয়ে যায়। শিশুর মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতে জানান– কেঁচো তুলতে গিয়ে তিনি পড়েছেন সাপের ফণার মুখে। তিনি তবু এখনো দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারেনি হাসানের মা। স্ট্রোকের আঘাতে ধরাশায়ী। পড়ে আছে চেতনাশূন্য মানবপিণ্ড। দুচোখের তারা দুটিও স্থির অচঞ্চল।

কোথায় কেঁচো, কীসের সাপ–এসব বাঁকা কথার প্রতীকী ইঙ্গিত ধরতে পারে না হাসান আক্তার। বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে সোজাসুজি জানতে চায়,

পারুল কোথায় বাবা?

ছেলের হাত ধরে টানেন আক্তারুজ্জামান,

রুগীর সামনে এভাবে চিৎকার করতে নেই বাবা, এই ঘরে আয়।

ঘর বদল করার পরও প্রসঙ্গ বদলায় না হাসানের, আবার সে বলে,

কোথায় গেলে পারুলকে পাওয়া যাবে বলো বাবা, আমি সেইখানে যাব।

আজকের শুভদিনে ওসব কথা থাক হাসান।

বাবার কণ্ঠ থমথমে। হাসানের তবু ভয়ডর করে না। রীতিমতো রুখে ওঠে,

কীসের শুভদিন?

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলে সেটা শুভদিন নয়!

কিন্তু তোমার ঘরই যে ফাঁকা বাবা! আমার বোন কোথায়? আমার পারুল বোন ...

অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান পুত্রকে বুঝাতে চেষ্টা করেন,

বাহাত্তরের এই দিনে, এই দশই জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফেরেন, তখনও এই দশা হয়েছিল। কত মা-বোনের খবর অজানার গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল, তার কি ঠিকঠিকানা আছে!

কী বলছ বাবা! সেটা ছিল যুদ্ধের সময়। তাই বলে...

নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দেন বাবা,

যুদ্ধ এখনো চলছে! এরই মাঝে দশই জানুয়ারি এসেছে, তুই ফিরে এসেছিস, আমার আবার ভাবনা কী?

হাসান অবাক চোখে বাবার মুখের দিকে তাকায়। এই মানুষটি একইসঙ্গে তার শিক্ষকও বটে। তবু যেন কত অচেনা মনে হয়। কেমন অবলীলায় তিনি বলতে পারেন,

ওই যে উঁচুতে আছেন সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধু, আজকের এই দিনে তুই ফিরে এলি দেশে, তোকে আর কোথাও যেতে দেব না বাবা। এইখানে, তোর এই জন্মমাটি থেকেই তোকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

ভেতরে ভেতরে হাসান আক্তারের কী যে ওলটপালট হয়, সহসা ছেলেমানুষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবার বুকের মধ্যে। ফুলে ফুলে ওঠে তার শরীর। পুত্রের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে পিতা ছড়িয়ে দেন আশ্বাসবাণী– তুই ঘুরে দাঁড়ালেই দেখিস আমরাও দাঁড়াব তোর পেছনে। পারুল তখন পালাবে কোথায়!

আল্লাহ তুমি সবার উপরে

ম. মীজানুর রহমান

আল্লাহ তুমি সবার উপরে
তোমার উপরে কেহ নাই।

তোমার সৃষ্ট সব রহস্যে
ক্ষণে ক্ষণে তাই তোমাকে জানিতে চাই।
আকাশে-বাতাসে কত কথা হয়
তাহার তো কোনো কূলকিনারা নাই;
শত সহস্র কেতাবের যত শব্দাড়ম্বরে
তোমাকে জানিতে চাই।
আল্লাহ তুমি সবার উপরে
তোমার উপরে কেহ নাই।

মাঠে মাঠে যত শস্য-শ্যামল,
নদী ভরা জল সমুদ্র অতল;
বৃক্ষ, তরু, মহিরুহ, ফল ও ফসল, যাহা দেখি
জীব-জানোয়ার, কীটপতঙ্গ, যত পশুপাখি,
আমাদের মতো সকলেই জপে তোমার নামটি নাকি!
আহা! পাহাড়-পর্বত
দেখি কত জলস্রোত
বয়ে চলে দিবারাতি;
আকাশে তারকাপুঞ্জ আঁধারে আলোর সাথি।
আমাদের মতো সকলেই জপে তোমার নামটি নাকি!
যেমন আমরা প্রতি নিশ্বাসে তোমাকেই ডেকে থাকি!
মাটি কিম্বা পাহাড়ের বুকে তাই কি
তোমার নামটি শিল্পীরাও করে খোদাই!
সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে শুনি তাই–
আল্লাহ তোমার পবিত্র নামটি সকলেই বুঝি গায়!
আল্লাহ তুমি সবার উপরে
তোমার উপরে কেহ নাই।

নিশ্বাসে তুমি, বিশ্বাসে তুমি,
আকাশ ব্যাপিয়া আসিয়া মর্ত্যভূমি;
তোমাতেই আমি, তুমি অন্তর্যামী;
মরমিয়া তুমি জানি দিবাযামী,
আর কেহ নাই, তুমি শুধু তুমি!
আল্লাহ তুমি সবার উপরে
তোমার উপরে কেহ নাই।

স্বপ্নে কিংবা জাগরণে তাই
এবাদত করি, বন্দেগি গীত গাই!
আল্লাহ তুমি একক সত্তা, পরম সত্য,
তাহার উপরে পাইনি যে-কোনো অন্য তথ্য,
উপাত্ত যে কিছু নাই!
অসীম আকাশে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা
সবই দেখিতে পাই
কিন্তু এই অসীম বিশ্বে তুমি কোথায়?
সবকিছু থেকেও যে হই আমিই সর্বহারা।
আল্লাহ তুমি সবার উপরে
তোমার উপরে কেহ নাই।

আল্লাহ, এ দুনিয়ায় আর কেহ নাই
তোমার উপর পাল্লা দেওয়ার– সত্য তুমি রবে তাই
আর সবে যাবে পরপারে,
খুঁজিয়া পাবে না কেহ তো কাহারে,
আল্লাহ আল্লাহ বলিবে সবাই–
তখন কেহ কাহারো নাই!
সত্য কেবল তুমিই রবে আর সবে যাবে পরপারে;
খুঁজিয়া পাবে না কেহ তো কাহারে।
হায়! হায়! হায়! আল্লাহ! আল্লাহ! বলিবে সবাই!
আল্লাহ তুমি সবার উপরে
তোমার উপরে কেহ নাই।

কেউ দ্যাখে নাই কোথায় থাকে এ জীবন-বায়ু;
কেউ তো পারে না বলিতে কার কতটুকু আয়ু!
এমন রহস্য কারও জানা নাই;
আল্লাহ তোমাতে বিশ্বাস তাই আরও গাঢ় হয়ে যায়!
জানি না তোমায়, বুঝি না তুমি থাকো কোথায়;
তবু এইটুকু ভাবি ক্ষণে ক্ষণে, মনে মনে
প্রতি নিশ্বাসে তোমাকে পাই।
আল্লাহ তুমি সবার উপরে
তোমার উপরে কেহ নাই।

লাল-সবুজের বিজয় নিশান

ঈমাম হোসাইন

সেন বংশীয় লক্ষ্মণ, বল্লাল আর পাল বংশীয় গোপাল, ধর্মপাল,
তোমাদের আঁকা মানচিত্র দলিত-মথিত করেছে
লুটেরা তুর্কির সুলতান, বর্গি আর শ্বেতহস্তিরা
বার বার এ জনপথ হয়েছে রক্তাক্ত, মৃতপ্রায় ভাগাড়।

হাজার বছরে যাত্রায় আমার মাতৃভূমি
হয়েছে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, শোষিত
চাবুক চালিয়েছে বহুবার আমার মানচিত্রে, সিরাজের স্কন্ধে
শক্তিমান বীর যোদ্ধাদের চেষ্টাও হয়েছে বহুবার।

তারপর ধ্বনিত হলো এক মহামানবের আগমন তিথি
শোষিত বাঙালি শক্ত মেরুদণ্ডে আওয়াজ তুললো–
ফিরিয়ে দাও আমাদের স্বদেশ, মানচিত্র ও পতাকা।
বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়লো নতুন স্বদেশ বিনির্মাণে
এক সার্বভৌম তর্জনীর ইশারায়।

বাহাদুরপুরের শিকারি বাড়ি, রামশীলের বালা বাড়ি,
তাকিয়ে দেখো– আকাশে উড্ডীয়মান লাল-সবুজের বিজয় নিশান।
সোনাগাজীর মহেন্দ্র চৌকিদার বাড়ি, সজল হাওলাদার বাড়ি
দেখো, মঙ্গলকান্দী স্কুলে উড়ছে লাল-সবুজের বিজয় নিশান।

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সৈয়দ নাছির, খাজু মিয়া, বাকাউল আর খলিল বাহিনী–
শত-সহস্র অভিনন্দন, বিজয়ী বীর বাঙালি।
তোমাদের পদতলে পিষ্ট বিহারি সৈয়দ খামার, পীর আরব সাহেব,
মেজর গুল মোহাম্মদ, একাই মাতব্বর।
এরা আজ ধিক্কৃত, ঘৃণিত; এরা ইতিহাসে পাপিষ্ঠ নরাধম।

আজ বিজয় পতাকা উড়ছে চারদিকে,
আজ চলছে লাল-সবুজের বিজয় মহোৎসব।

বঙ্গবন্ধু আমার বাংলাদেশ

আনসার আনন্দ

তুমি তো বঙ্গবন্ধু
রেখেছ তোমার কথা–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
তোমার অঙ্গুলিসংকেত
আজ আকাশে মুক্তবিহঙ্গ
আমার লাল-সবুজের পতাকা
তুমি তো বঙ্গবন্ধু
রেখেছ তোমার কথা
রক্ত যখন দিয়েছি
রক্ত আরও দেবো।
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো
ইনশাআল্লাহ।
ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর
বাড়ির সিঁড়ি নেমে যায়
পদ্মা মেঘনা যমুনায়
নেমে যায় বঙ্গোপসাগরে
শুধু রক্তস্রোত, এক সাগর রক্ত।
ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে
ফোটে যে ফুল তার নাম
বঙ্গবন্ধু, তার নাম বাংলাদেশ।

জাতির পিতা স্মরণে

মো. রুহুল আমিন

ম-হান নেতা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান,
হা-জার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির পেয়েছেন তিনি সম্মান।
ন-দীর স্রোতে, গাছের পাতায়, আকাশের পানে চাই,
নে-তাকে মোরা কাঁদিয়া খুঁজেছি কোথাও তিনি নাই।
তা-কায়ে রয়েছে কোটি জনতা নির্ঘুম দিবারাতি,
জা-তির জনক বঙ্গবন্ধু মনে হয়, সবার সাথি।
তি-নিই জনতা, তিনি বাঙালি-হৃদয়ের শাপলা ফুল,
র-ক্ত দিয়ে শহিদ হয়েছেন করেননিকো কোনো ভুল
পি-তার মতো বুকে টেনে নিয়ে দুখিরে করেছেন যতন,
তা-হাকে যাহারা চোখে দেখিয়াছে, দেখেছে পরম রতন।
শে-খ সাহেবের কলিজাখানি এতই বিরাট ছিল,
খ-র স্রোতা নদীর মতো সব দুঃখ ভাসায়ে নিল।
মু-জিব! মুজিব! তুমি মরো নাই বেঁচে আছ কোটি বাঙালির মনে,
জি-নিয়া আনিছ, ছিনায়ে নিয়েছ স্বাধীনতা প্রতিজনে।
ব-হমান রবে পদ্মা-যমুনা, মেঘনা-মধুমতি,
র-বে তব নাম শোণিতে বাঙালির স্মরিতে বীরের জাতি।
র-বের নিকটে এই দোয়া চাই বেহেশতে দিও তাঁরে,
হ-য়তো মুজিব ফিরিবে না জানি, তবুও সবার ঘরে।
মা-বাবার পাশে ঘুমিয়ে রয়েছ, ওহে বাঙালি বীর,
নে-ই তুমি আজ আমাদের মাঝে রয়েছে সোনার কুটির।
র-হম করো আল্লাহ মাবুদ শেখ মুজিবের দেশে,
জ-নমের মতো বিদায় নিয়েছেন রক্তস্নাত বেশে।
ন-ফরের ছেলেরা বধিল তোমায় হীনস্বার্থের জন্য,
মো-রা কাঁদিয়াছি নিরলে বসিয়া তুমি হইয়াছ ধন্য।
শ-ক্ত হস্তে দমন করিছে তোমার শত্রুগণে,
ত-খতে বসিয় তোমার কন্যা, জানে তা প্রতিজনে।
ব-ছরের পর বছর আসিবে উন্নত হবে দেশ,
ছ-বরের সাথে, এই দুনিয়াতে ভুলিয়া হিংসা-দ্বেষ।
র-হিবে হেথায় সোনার বাংলা লক্ষ বছর ধরে,
ছা-ড়িয়া যাইতে এই দেশখানি মনটা কাঁদিয়া মরে।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়তে যদি পারো,
ম-রণের কালে এই কালেমা শান্তি দিবে আরও।

প্রত্যাবর্তন

আবুল হোসেন আজাদ

রৌদ্রকরোজ্জ্বল সফেদ দুপুর
অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক মুহূর্ত
বাঙালি জাতির এক অনন্য দিন
দশই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর।

বঙ্গবন্ধু এলেন মধ্যাহ্ন দুপুরে
তাঁর লালিত স্বপ্ন সাধের
যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলার মাটিতে
আকাশে-বাতাসে খুশির ঊর্মিমালা।
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রাণে প্রাণে উচ্ছ্বাস।
জাতির পিতা শেখ মুজিবুর ফিরলেন
সোনার বাংলায়– বাংলাদেশে।

পাখিরা আবার ডানা ঝাপটালো অসীম দিগন্তে
ফুলেরা প্রস্ফুটিত হলো সৌরভ বিলিয়ে
এ যেন এক ঈদের বারতা খুশির প্রাণচঞ্চলতায়
চারদিকে জনতার ঢল গগনবিদারী স্লোগান
তোমার আমার ঠিকানা– পদ্মা মেঘনা যমুনা
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু মুহুর্মুহু।

দিনটি ফিরে এলে প্রতিবছর
আমরা আপ্লুত হই তাঁকে স্মরণে শ্রদ্ধায়
যিনি আমাদের এনে দিয়েছেন একটি স্বাধীন দেশ
আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি
যাঁর স্বাধীনতার ডাকে।

দশই জানুয়ারি

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

দীর্ঘ নমাস যুদ্ধ শেষে
স্বাধীন হলো দেশ
বঙ্গবন্ধুর জন্য সবার
অপেক্ষার নেই শেষ।

বঙ্গবন্ধু বন্দি ছিলেন
পাকিস্তানের জেলে
মুক্তি চেয়ে ক্ষুব্ধ ছিল
লক্ষ দামাল ছেলে।

বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেলেন
মহান বীরের বেশে
বিলাত-ভারত হয়ে আসেন
নিজের স্বাধীন দেশে।

লক্ষ কোটি বীর জনতা
টেনে নিলো বুকে
সবার কাছে কৃতজ্ঞ হন
স্বাধীনতার সুখে।

মহান নেতার পরশ পেয়ে
খুশি সবাই ভারি
সেদিন ছিল '৭২-এর
দশই জানুয়ারি।

শেখ হাসিনা

বদরুল হায়দার

মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা
দেশজুড়ে দরদি অনন্যা
মানবতার উদার বন্যা
জয় বাংলার শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা
জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা।
বিশ্ব নারীর শীর্ষে থেকে
মা ও মাটির আদর মেখে
সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখে
উন্নয়নের শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা
বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।
এপার-ওপার বাংলাজুড়ে
তোমার খ্যাতির পায়রা উড়ে
শান্তির স্বপক্ষে লড়াইয়ের দৌড়ে
মানবতার মা শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা
শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা।
পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেলে
গ্রামকে শহর এক যুগলে
দেশ গড়েছেন ডিজিটালে
সমুদ্রজয়ী শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা
আঁধারে হয় আলোর বন্যা
দেশরত্ন শেখ হাসিনা
বিশ্বনেতা শেখ হাসিনা।

ভালোর তরে

আবু জাফর আবদুল্লাহ

চারদিকে হৈ হুল্লোড় শুধু হৈচৈ
কাজের কাজ নেই ভাজতে চায় খৈ।
ধান-পান নিয়ে গেছে এবার 'বুলবুল'
মাথায় হাত বসে আছে মিয়া মকবুল।
নবান্নের উৎসব হলো না এবার
কৃষানির মনে তাই দুঃখ অপার।
ঝড়-ঝঞ্ঝা দেন খোদা মানুষের দোষে
দেশ আজ ভরে গেছে পাপ-পরশে।
ভালো হওয়া ভালো, ভালোর তরে
শান্তির ঝরনা ঝড়বে সবার ঘরে।
অনেক হলো। এবার চলো দিয়ে পাল্লা
মনে মনে বলবে, 'লা-শারীক আল্লাহ'।

নতুন রূপে নতুন বাংলাদেশ!

শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী

হে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু!
১৯৭৫ সাল হতে আছ তুমি ঘুমিয়ে টুঙ্গিপাড়ায়,

সব হারিয়ে জেগে আছে তোমার দুই কন্যা,
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা।
শেখ হাসিনার হাত ধরে
বাংলাদেশ আজ এক অনন্যা!

১৯৮১-তে বঙ্গবন্ধুর জয় বাংলা নৌকার,
হাল ধরেছে শেখ হাসিনা,
দেশে-বিদেশে চলেছে নৌকা,
থামাতে তারে কেউ পারে না।

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বহু উন্নয়নে ভাসছে দেশ,
একতলা, দুতলা ফ্লাইওভারগুলো আর
দু-চার-ছয়-আট লেনের রাস্তাগুলো লাগছে বেশ।

স্বাধীন দেশের মুক্ত আকাশে
উড়ে চলেছে হংসবলাকা, গাংচিল, অচিন পাখি আর রাজহংস
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর আদেশে,
জঙ্গি-সন্ত্রাস, মাদক-দুর্নীতি হচ্ছে সব ধ্বংস!

স্বপ্নের 'মেট্রোরেল' ঐ আসছে ধেয়ে পারমাণবিক বিদ্যুতে
যানজট আর জনদুর্ভোগ বিনাশে,
'পদ্মা সেতুর রেলে' চড়ে, 'কর্ণফুলি টানেল' দিয়ে
'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে' বাংলাদেশ এখন মহাকাশে!

'কিসিঞ্জারের মিথ্যে তলাবিহীন ঝুড়ি'
নয়কো কভু বাংলাদেশ,
ভাত-কাপড় আর মাছ-মাংসে ভরা দেশে,
ক্ষুধা-দারিদ্র্য আর অশান্তির দিন প্রায় শেষ।

উন্নয়নের জয়যাত্রায় এগিয়ে চলেছে
অদম্য এক ডিজিটাল বাংলাদেশ!
অবাক বিশ্ব তাকিয়ে রয়, এ কোন বাংলাদেশ?
উন্নয়নের যার নেইকো শেষ!

হে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু!
মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, তোমার সোনার বাংলার সোনার দেশ,
'রূপকল্প ২০৪১'-এর মধ্যে হয়ে উঠবে,
সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরা উন্নত এক বাংলাদেশ!

নদী ও জীবন

রোকসানা গুলশান

নদী, ক্লান্তিহীন তোমার বুকে
ক্লান্ত আমাকে রাখো,
যেন অন্ধকারেও ঢেউকে বুঝি।
মানুষের মুখে মানুষ খুঁজে খুঁজে
যখন ক্লান্তি আসে,
নদীর দিকে যেতে দেখি
প্রশান্ত জামবনের বিনম্র প্রজ্ঞার ছায়া।

নিউরনে রক্তকণিকায় জেগে–
নাম ধরে তাই ডাকছি তোমায়,
নিয়ে যাও।
ছোটো ছোটো কথার ঢেউয়ে
শোনাও সত্য ভাষণ
কতটা সীমাবদ্ধতায় জীবন ঘুরপাক খায়
ঘোলাজলের পঙ্কিলতায়?
নিয়ে সুদূর নীলের পরশ
চেতনা জাগাও।
কীভাবে পাও ধাওয়ার গতি?
কীভাবে নানা ঢেউয়ের হয় সম্মিলন?

বিন্যস্ত ফুলের মতো এক হয়ে যাও
গভীর আত্মায়।
সন্ধ্যারাগের সুর-সুবাসে
যখন কাঁপে ঘাসের প্রাণ
তুমি তখন চাঁদজোয়ারে ভাসো।

নদী অন্তর জাগাও
অনন্ত চাওয়ার সাগরমুখী অভিযাত্রায়–

স্রোতে ভাসা নয়, স্রোতে ফিরে পাওয়া
জীবনাতীত জীবনে...

ঝড়-তুফানে

সনজিত দে

ঝড়-তুফানে সবাই যখন ঘরের ভেতর থাকে
মা তখনি খোকাকে তার বুকে আগলে রাখে ।
আমার বেলায় অন্যরকম আটকে কে আর রাখে
মা কি আমায় খোকন বলে কখনো কি ডাকে ?

মা গিয়েছে সেই যে কবে ঝড়ো হাওয়া রাতে
আর ফিরেনি হয়নি কথা কখনো মার সাথে ।
ঝড়-তুফানে তাই তো আমি ঘরে থাকি না যে
কখনো পাই খুঁজে যদি মাকে ঝড়ের মাঝে ?

ঝড় এলে মা বলত আমায়, যা বাছাধন ঘাটে
কত্তো মানুষ বিলেঝিলে আটকে আছে মাঠে ।
যা বাছাধন নৌকা নিয়ে করতে তাদের পার
মনে রাখিস সারা গেরাম আমরা এক সংসার।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদান অতুলনীয়

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদান ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সবই হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলার রূপকার। ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীকে শপথ বাক্য পাঠ করান –পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, ঐতিহাসিক ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ দিনে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ২০২১ সালে আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গঠনে আমাদের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে সফলতার পথ ধরে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের পথে আরও সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবো।

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র হয়ে উঠবে বাংলাদেশ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, সবাইকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মহাসড়কে শামিল করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবো– এ প্রত্যাশা করি। রাষ্ট্রপতি ২রা জানুয়ারি 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২২' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের জাতীয় সমাজসেবা দিবসের প্রতিপাদ্য 'মুজিববর্ষের সফলতা, ঘরেই পাবেন সকল ভাতা'–যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিজিবি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' হিসেবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী-শিশু এবং মাদক পাচার রোধে সীমান্তে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বিজিবি। রাষ্ট্রপতি ২০শে ডিসেম্বর 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস ২০২১' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই অগ্রযাত্রায় বিজিবিও তার অবস্থান থেকে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজিবির সব সদস্য সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন– এটাই সবার প্রত্যাশা।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার আহ্বান

জনগণের মাঝে সংযুক্তি, ব্যাবসাবাণিজ্য এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়ে মনোনিবেশ করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৫০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে কাজ করার জন্য পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৬ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে মৈত্রী দিবস বা ফ্রেন্ডশিপ ডে উপলক্ষে আয়োজিত বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে ভিডিও বার্তায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার সৈনিকরা প্রস্তুত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই ডিসেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আইসিটি মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার সৈনিকরা প্রস্তুত হয়েছে। আগামীতে প্রযুক্তি খাতে রপ্তানি আয়ের তৈরি পোশাক খাতকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে থেকে নতুন প্রজন্মের যারা পুরস্কার পেল তাদের যে মেধা বিকাশের সুযোগ হলো তাতে এখন আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে আইসিটি খাতের অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

দেশপ্রেম, দেশসেবা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই ডিসেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ৮১তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সমাপনীতে রাষ্ট্রপতি প্যারেড অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সব নবীন অফিসারকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, আজকের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তোমাদের ওপর ন্যস্ত হলো দেশমাতৃকার মহান স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে নবীন অফিসারদের সজাগ এবং সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে হলেও দেশপ্রেম, দেশসেবা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখাই পেশাগত জীবনের প্রধান ব্রত বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে এবং জাতির পিতা প্রণীত সুদূরপ্রসারী প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়ন হয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃতি ক্যাডেটদের কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৪টি আইনের খসড়া অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই ডিসেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস আইন, বাণিজ্য সংগঠন আইন, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র আইন এবং একাদশ জাতীয় সংসদের ২০২২ সালের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেবেন তার খসড়া ও বাংলাদেশ-মালদ্বীপের দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে অনুস্বাক্ষরিত চুক্তির সংশোধিত খসড়া অনুমোদন দেন। এছাড়া এদিন গণভবনে *বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ভাবনা* ও *বাংলাদেশ* স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন ২০শে ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকায় বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার এডমিরাল (অব.) মো. খুরশেদ আলম এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত সাইদ মোহাম্মদ আল মেহরিকে 'বঙ্গবন্ধু মেডেল ফর ডিপ্লোমেটিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০' তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন –পিআইডি

বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে ডিসেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বেইলি রোডের বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু মেডেল ফর ডিপ্লোমেটিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০' প্রদান

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন। প্রথমবারের মতো এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার রেখে যাওয়া রাষ্ট্রনীতি 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'-এর আলোকে সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রেখেই আগামীদিনের দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রতিবছর এ পদক প্রদানের মাধ্যমে কূটনীতিকগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অনুপ্রাণিত হবেন। পাশাপাশি আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর কূটনীতিকগণ ও তাদের স্ব-স্ব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নতুন শিখরে উন্নত করতে উৎসাহিত হবেন বলে বিশ্বাস করেন প্রধানমন্ত্রী।

মুজিব স্মারকগ্রন্থ ও মুজিববর্ষে স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে ডিসেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রকাশিত গ্রন্থ ও মুজিববর্ষের স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী *বঙ্গবন্ধু ও বিচার বিভাগ* এবং *বঙ্গবন্ধু অ্যান্ড জুডিশিয়ারি* শীর্ষক বাংলা ও ইংরেজি মুজিব স্মারকগ্রন্থ এবং *ন্যায়কণ্ঠ* শীর্ষক মুজিববর্ষের স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

নদনদী রক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর গর্বিত জাতিকে স্বপ্নের ঠিকানায় নিয়ে যেতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের শিরা-উপশিরার মতো নদনদীগুলোকে রক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নদীবাহিত পলি সমাবেশে নতুন জমি জেগে উঠার উদাহরণ যেমন রয়েছে, তেমনি আছে ভবিষ্যৎ অমিত সম্ভাবনা। ২৬শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইজ থেকে ছেড়ে যাওয়া পরিদর্শী জাহাজে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু: শাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনে নদীর অনেক প্রভাব। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার এবং আমাদের সবার জীবনেই নদীর অনেক প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সমস্ত কিছু আক্রান্ত, এরপরও বাংলাদেশের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশে প্রবাহিত ৫৮টি যৌথ নদী বছরে প্রায় দুই বিলিয়ন মেট্রিক টন পলি বহন করে এবং সমুদ্রের তলদেশে সেটি জমা হয়। এতে করে নতুন জমি সমুদ্র থেকে উদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যেই অনেক জমি উদ্ধার হয়েছে। আজকের ভাসানচর সাত বছর আগে ছিল না। নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ছিল না। পরিপূর্ণভাবে একটি নতুন উপজেলা গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ সমুদ্র থেকে জমি উত্তোলনের বিরাট একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২১০০ সালের বদ্বীপ পরিকল্পনা বিষয়টিতে আলোকপাত করা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এসময় নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু যেভাবে নদীকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কথা ভাবতেন, সেই পথ ধরেই নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার নদীপথ ইতোমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে এবং আরও নদীপথ উদ্ধারের জন্য ড্রেজার ও জাহাজ কেনা হয়েছে। দল-মতের উর্ধ্বে উঠে প্রতিমন্ত্রী নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

দেশের অগ্রগতি জনগণের কাছে তুলে ধরা গণমাধ্যমের নৈতিক দায়িত্ব

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি আজ বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত এবং দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা মানুষের কাছে তুলে ধরা আমাদের গণমাধ্যমের নৈতিক দায়িত্ব। ২৩শে ডিসেম্বর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর পরিচালিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প থেকে প্রকাশিত *জাতির পিতা শেখ মুজিব* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৩শে ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর পরিচালিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প থেকে প্রকাশিত জাতির পিতা শেখ মুজিব গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন –পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, জাতির উন্নয়ন-অগ্রগতি যদি অব্যাহত রাখতে হয়, দেশকে যদি স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হয়, হতাশাগ্রস্ত মানুষ দিয়ে তা সম্ভবপর নয়। সবসময় খারাপ সংবাদ পরিবেশন করলে মানুষ হতাশাগ্রস্তই হবে এবং হতাশ মানুষ দিয়ে জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। কোনো নেতিবাচক খবরের যদি সংবাদমূল্য থাকে তবে তা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। কিন্তু একইসঙ্গে আজকে বাংলাদেশ যে পাকিস্তান ও ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, সে অগ্রগতির কথাটাও মানুষকে জানানো অত্যন্ত প্রয়োজন।

দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে দেশ

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষের বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৮ই ডিসেম্বর

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিজয় শোভাযাত্রা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণের উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে সমবেত লাখো জনতার উদ্দেশে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, পঞ্চাশ বছরের পথচলায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা, উন্নয়ন-অগ্রগতির বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে। সমস্ত ষড়যন্ত্র, প্রতিবন্ধকতাকে উপড়ে ফেলে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি, বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন পূরণের পথে দেশ দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে। তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তিনি পলে পলে বাঙালি জাতিকে আন্দোলিত করে স্লোগান শিখিয়েছেন– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো; তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'। তাঁরই নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ, আর তিনিই এর মহান স্থপতি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এসময় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, জাতীয় চার নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ ও আত্মদানকারী মা-বোনকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ১৯৭১-১৯৭২ সালে যারা সংশয়ে ছিলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কি না, উন্নত-সমৃদ্ধ হতে পারবে কি না, তারা আজ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, বাংলাদেশ আজ খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ। বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

তুরস্কের রাজধানী আংকারায় বঙ্গবন্ধু বুলভার্ডের চার রাস্তার মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য ১৩ই ডিসেম্বর ২০২১ উদ্‌বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

আংকারায় বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য উদ্‌বোধন

তুরস্কের রাজধানী আংকারায় বঙ্গবন্ধু বুলভার্ডের চার রাস্তার মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য ১৩ই ডিসেম্বর উদ্‌বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে আংকারায় বঙ্গবন্ধু বুলভার্ডে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আংকারার গভর্নর ওয়াসিপ শাহিন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম, আংকারার মেয়র মনসুর ইয়াভাস, ডেপুটি মেয়র সেলিম সিরপান লৌ এবং তুরস্কে বাংলাদেশ হাইকমিশনার মাসুদ মান্নান। অনুষ্ঠানে ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, এটি আমাদের জন্য গর্বের দিন।

ঢাকা-মালে শীর্ষ বৈঠক

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহর আমন্ত্রণে ২২-২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় দিনের মালদ্বীপ সফর করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৩শে ডিসেম্বর তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিনে যোগ্য স্বাস্থ্য পেশাদার নিয়োগ এবং যুব ও ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে দুটি সমঝোতা স্মারক এবং দ্বৈত আয়কর বিলোপের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) নবায়ন করা হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশ মালদ্বীপকে ১৩টি সামরিক যান উপহার দিয়েছে। দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং উপকরণ হস্তান্তর অনুষ্ঠানের পর একটি যৌথ ইশতাহার ঘোষণা করা হয়। সফরকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফয়সাল নাসিম, পিপলস মজলিসের স্পিকার মোহাম্মদ নাশিদ এবং প্রধান বিচারপতি উজ আহমেদ যুথাসিম আদনানের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। ২৩শে ডিসেম্বর মালদ্বীপের সংসদে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

'নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২১' শীর্ষক উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের এ মহাকাশ সংস্থা আয়োজিত প্রতিযোগিতায় 'নাসা বেস্ট মিশন কনসেপ্ট' ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের মনোনীত দল 'টিম মহাকাশ'। বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর ১০টি ক্যাটাগরিতে ১০টি সেরা উদ্ভাবনকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে সংস্থাটি। এ বছর ১৬২টি দেশের ৪৫৩৪টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

বেসিস ও নাসার ওয়েবসাইট সূত্রে জানা যায়, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এবং বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির (বাউয়েট) তরুণ শিক্ষার্থীদের ছয় সদস্যের সম্মিলিত দল 'টিম মহাকাশ'। এর মধ্যে কুয়েটের শিক্ষার্থীরা হলেন– সুমিত চন্দ, আলভি রওনক, শিশির কৈরি। বাউয়েটের শিক্ষার্থীরা হলেন– বর্ণিতা বসাক তৃষা, সমির ইমতিয়াজ ও মমিনুল হক। বিজয়ী দলের সদস্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি নাসার বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ২০২২ সালের মাঝামাঝিতে বিজয়ীরা সশরীরে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

টিম মহাকাশের উদ্ভাবিত টুল 'এআরএসএস-অ্যাডভান্সড রিগোলিথ স্যাম্পলার সিস্টেম' মূলত ভিনগ্রহে অভিযানের সময় মুক্তভাবে উড়তে থাকা ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

চীন, ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে গেল বাংলাদেশ

কোভিডের ধাক্কা কাটিয়ে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানিতে গতি ফিরেছে। এতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের রপ্তানিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে দেশটিতে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক ও টেক্সটাইল পণ্য আমদানির হিসাব সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান 'দ্য অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেল' (ওটেক্স) প্রকাশিত হালনাগাদ পরিসংখ্যানে পাওয়া গেছে এ তথ্য। ২০শে ডিসেম্বর সংবাদ মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশিত হয়। ওটেক্সের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে তৃতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ উল্লিখিত সময়ে দেশটিতে পোশাক রপ্তানি করেছে ৫.৭ বিলিয়ন ডলারের, যা গত বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি।

বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকে পাকিস্তানকে ছাড়ালো বাংলাদেশ

গত ৫০ বছরে আর্থসামাজিক অনেক সূচকে বাংলাদেশ আগেই পাকিস্তানকে টপকে গেছে। বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে এবছর গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্স বা বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকেও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেল বাংলাদেশ। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম নলেজ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত *গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্স (জিকেআই)* ২০২১ শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ১৪ই ডিসেম্বর এটি প্রকাশিত হয়। বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকে চলতি বছর ১৫৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম। আর পাকিস্তানের অবস্থান ১২৩তম। প্রতিবেদনের তথ্য মতে, সূচকটি তৈরিতে শিক্ষা, প্রযুক্তি, উন্নয়ন, উদ্ভাবনসহ সাতটি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো: প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, প্রযুক্তি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সাধারণ সহায়ক পরিবেশ। তালিকাটি সাতটি সেক্টরের অধীনে ১৫৫টি চলকের (ভেরিয়েবল) ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

বাণিজ্য মেলা হচ্ছে স্থায়ী কেন্দ্রে

১লা জানুয়ারি থেকে পূর্বাচলের স্থায়ী প্রদর্শনী কেন্দ্রে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এবারের মেলা উদ্‌বোধন করেন। দীর্ঘ একযুগ চেষ্টার পর দেশে প্রথমবারের মতো স্থায়ী ভেন্যুতে ২৬তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচিত ও কাঙ্ক্ষিত এই প্রদর্শনী কেন্দ্রটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার (বিবিসিএফইসি)'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরই ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা স্থায়ী কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। 'মেইড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে দিতে বিশ্বমানের একটি স্থায়ী 'পণ্য প্রদর্শনী কেন্দ্র' তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে। বাণিজ্য মেলা শেষ হওয়ার পর এই ভেন্যুতে সারা বছর বিভিন্ন খাতভিত্তিক মেলা আয়োজন করার সুযোগ থাকছে। এর বাইরে বিদেশি যে-কোনো প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা পূর্বাচলের এই স্থায়ী প্রদর্শনী কেন্দ্রে পণ্যের প্রচারের জন্য মেলার আয়োজন করতে পারবে। উল্লেখ্য, বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশে এ ধরনের স্থায়ী প্রদর্শনী কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। এতে বিদেশি উদ্যোক্তা, ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ফাইভ-জি যুগে বাংলাদেশ

দেশে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলো ফাইভ-জি সেবা। ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রা ত্বরান্বিত করতে ও দেশের সব গ্রাহক যেন পঞ্চম প্রজন্মের (ফাইভ-জি) মোবাইল প্রযুক্তির অত্যাধুনিক সুবিধা উপভোগ করতে পারে, সেজন্য এই সেবা চালু করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই ডিসেম্বর ২০২১ গণভবনে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১' এবং '৫-জি নেটওয়ার্ক সেবা উদ্‌বোধন' উপলক্ষে স্মারক খাম ও ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন –পিআইডি

প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রীয় টেলিকম অপারেটর টেলিটক বাংলাদেশ পরীক্ষামূলকভাবে দেশে ফাইভ-জি সেবা চালু করেছে। ১১ই ডিসেম্বর রাজধানীর রেডিসন ব্লু হোটেলে 'নিউ ইরা উইথ ৫-জি' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে এ সেবার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

নতুন ফাইভ-জি সেবা উদ্‌বোধন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান। এতে বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ্। প্রাথমিকভাবে হুয়াওয়ে ও নোকিয়ার সহযোগিতায় ছয়টি সাইটে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়। সাইটগুলো যেসব এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো– বাংলাদেশ সচিবালয়, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু স্মৃতিসৌধ, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল।

দেশে উৎপাদিত ফাইভ-জি মোবাইল যাচ্ছে আমেরিকায়

বাংলাদেশে উৎপাদিত ফাইভ-জি মোবাইল ফোন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেন, সরকারের প্রযুক্তিবান্ধব নীতির কারণে দেশে বিশ্বমানের ১৪টি মোবাইল কোম্পানি মোবাইল ফোন কারখানা করেছে। আরও চারটি কারখানা স্থাপন পাইপ লাইনে আছে। নেপাল ও নাইজেরিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে আমাদের উৎপাদিত ল্যাপটপ ও কম্পিউটার রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ফাইভ-জি মোবাইল ফোন যুক্তরাষ্ট্রেও রপ্তানি করা হচ্ছে। ৬ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী মেকার কমিউনিকেশন আয়োজিত 'স্মার্টফোন ও ট্যাব এক্সপো ২০২২'-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশ ডিজিটাল ডিভাইস আমদানিকারক একটি দেশ ছিল। তবে এখন আমরা বিভিন্ন ডিভাইস উৎপাদন এবং রপ্তানি করছি। আমদানিকারক থেকে উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারী দেশে রূপান্তর হওয়াটা আমাদের জাতীয় জীবনে এক অভাবনীয় অর্জন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

দুই পোশাক কারখানা পেল লিড সনদ

পরিবেশসম্মত সবুজ কারখানার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন বা লিড সনদ পেয়েছে দেশের আরও দুই পোশাক কারখানা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবি) এ সনদ দেয়। কারখানা দুটি হচ্ছে, শারমিন অ্যাপারেলস অ্যান্ড শারমিন ফ্যাশনস এবং এএম ডিজাইন লিমিটেড। শারমিন অ্যাপারেলস অ্যান্ড শারমিন ফ্যাশনস পেয়েছে লিডের প্লাটিনাম ক্যাটাগরি। বিভিন্ন সূচকে ১১০ পয়েন্টের মধ্যে ৮০ পয়েন্টের উপরের কারখানাকে প্লাটিনাম সনদ দেওয়া হয়।

এএম ডিজাইনের ক্যাটাগরি গোল্ড। রেটিং পয়েন্ট ৬০ হলেই গোল্ড ক্যাটাগরির সনদ দেওয়া হয়। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে নতুন এই দুই কারখানার তথ্য জানা গেছে। নতুন দুই কারখানা মিলে দেশে এখন লিড সনদের কারখানার সংখ্যা দাঁড়াল ১৫৪টি।

দেশেই তৈরি হবে নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি তৈরি করবে বলে জানান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের মাধ্যমে নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শুধু গাড়ি সংযোজন নয়, আমরা বাংলাদেশে গাড়ি উৎপাদন করব। বাংলাদেশে কারখানা স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে মিতসুবিশি মটরসের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১১ই জানুয়ারি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রকল্পে গাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

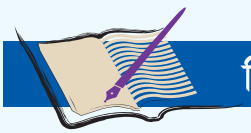

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু

সারা দেশে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০২১ শুরু হয় ২রা ডিসেম্বর। এবার পরীক্ষায় প্রায় ৪০ লাখ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। গ্রুপভিত্তিক তিনটি বিষয়ে নম্বর ও সময় কমিয়ে অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি পরীক্ষার প্রথম দিন সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই। কেউ এ নিয়ে অপপ্রচারের চেষ্টা করলে আইনের আওতায় আনা হবে।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল এবং পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৩০শে ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজন করে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০২১-এর ফলাফল প্রকাশের অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন এবং এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। এর আগে মাদ্রাসা, কারিগরিসহ ১১টি বোর্ডের চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ফলাফল গ্রহণ করেন। ফলাফলে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২২ লাখ ৪০ হাজার ৩৯৫ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ২০ লাখ ৯৬ হাজার ৫৪৬ জন। পাসের হার ৯৩ দশমিক ৫৮ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী একই অনুষ্ঠানে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বিবিধ প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে এআইআইবি

বাংলাদেশে টিকা কেনাসহ নানা প্রকল্পে আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে চীনের নেতৃত্বাধীন এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (এআইআইবি) আরও তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। এ সংক্রান্ত সব প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। যে-কোনো সময় বাংলাদেশ ও এআইআইবির সঙ্গে ঋণচুক্তি হবে বলে সম্প্রতি জানা যায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে।

ইআরডি সূত্র জানায়, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বিশ্ব ব্যাংকের মতো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো উন্নয়ন সহযোগী হয়ে উঠছে এআইআইবি। বাংলাদেশে সংস্থাটি ২০১৬ সাল থেকে অপারেশন শুরু করে। এ স্বল্প সময়ে ১৩টি প্রকল্পের আওতায় এরই মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে আড়াই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ চুক্তি হয়েছে। আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে আরও তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে সংস্থাটি। ফলে বাংলাদেশে এআইআইবির মোট বিনিয়োগ দাঁড়াবে সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইআরডি সূত্র জানায়, বড়ো বড়ো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত এআইআইবি। প্রকল্পের পিডিপিপি (প্রাক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা) প্রস্তুত হলেই বিনিয়োগ করে সংস্থাটি।

সরকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে

ডাবল ট্যাক্সেশন ও ব্যাংকিং চ্যানেলের জটিলতা দূর হলে রাশিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ আছে বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। ৬ই ডিসেম্বর সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভিকেনটিভিচ মানটিটস্কাইর সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ তথ্য জানান বাণিজ্যমন্ত্রী।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, রাশিয়া বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। উভয় দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। রাশিয়া বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী। রাশিয়ার সঙ্গে ব্যাবসাবাণিজ্য বাড়ানোর প্রচুর সুযোগ আছে। উভয় দেশ উদ্যোগী হলে ব্যাবসা বাড়ানো সম্ভব। তিনি বলেন, রাশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পণ্যের প্রচুর চাহিদা আছে। বাংলাদেশ রাশিয়ায় পণ্য রপ্তানি বাড়াতে চায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ১০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। বিশ্বের অনেক দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এখানে বিনিয়োগ করছে। অনেক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত সব কাজ ও আনুষ্ঠানিকতা সহজে এবং দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য নিরাপদ ও আকর্ষণীয় স্থান। রাশিয়ার বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ফোর্বস-এর ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় শেখ হাসিনা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী *ফোর্বস*-এর ২০২১ সালের বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় ৪৩তম স্থানে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বজুড়ে রাজনীতি, মানবসেবা, ব্যাবসাবাণিজ্য এবং গণমাধ্যমে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসা প্রভাবশালী নারীদের মধ্য থেকে ১০০ জনকে বেছে নিয়ে ৮ই ডিসেম্বর এই তালিকা প্রকাশ করেছে *ফোর্বস*।

রোকেয়া পদক পেলেন পাঁচ নারী

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পাঁচ নারীকে দেওয়া হয়েছে 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২১'। ৯ই ডিসেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন এবং 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২১' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা পুরস্কার প্রাপ্তদের পদক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কানফারেন্সের মাধ্যমে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে

বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে ৯ই ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রাপ্তদের মাঝে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন –পিআইডি

ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। রোকেয়া পদক পেয়েছেন যারা– নারী শিক্ষায় কুমিল্লার অধ্যাপক হাসিনা জাকারিয়া, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় যশোরের অর্চনা বিশ্বাস, নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে কুমিল্লার শামসুন্নাহার রহমান (মরণোত্তর), পল্লি উন্নয়নে কুষ্টিয়ার গবেষক সারিয়া সুলতানা এবং সাহিত্য, সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ জিনাত হুদা।

১০ সফল নারী পেলেন অনন্যা সম্মাননা

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১০ জন নারীকে দেওয়া হয়েছে 'অনন্যা শীর্ষ দশ সম্মাননা ২০২০'। ২৮শে ডিসেম্বর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে *পাক্ষিক অনন্যা* আয়োজিত অনুষ্ঠানে নারীদের হাতে এ সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। রাজনীতিতে সম্মাননা পেয়েছেন কামরুন নাহার জাফর, উদ্যোক্তা হিসেবে পেয়েছেন শহিদা বেগম, প্রযুক্তিতে অধ্যাপক লাফিফা জামাল, কৃষিতে অল্পনা রানী মিস্ত্রী, নাট্য নির্মাণে চয়নিকা চৌধুরী, করপোরেট পেশায় স্বপ্ন ভৌমিক, বিজ্ঞানে সেঁজুতি সাহা, অধিকার কর্মী হিসেবে ট্রান্সজেন্ডার তাসনুভা আনান, ক্রীড়ায় জাহানারা আলম, লোকঐতিহ্যে পেয়েছেন লাঠিয়াল রূপন্তী চৌধুরী।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল যুবসমাজ

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতেই ছিল দেশের যুবসমাজ। জাতীয় উন্নয়নে যুবশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তিনি যুবদের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। ২০শে ডিসেম্বর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের শহিদ শেখ কামাল অডিটোরিয়ামে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠনগুলোর হাতে অনুদানের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, যুব সংগঠনগুলো বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের সামাজিক উন্নয়ন, বেকার সমস্যা থেকে উত্তরণ ও স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, স্যানিটেশন, বায়োগ্যাস, সৌরশক্তির ব্যবহার, মৎস্য চাষ, পশুপালন, নার্সারি ও বনায়ন, হস্ত ও কুটিরশিল্প, বাল্যবিবাহ, ধূমপান ও মাদকবিরোধী অভিযানসহ নানা ধরনের কর্মসূচিতে দেশের যুব সংগঠনসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও যুবকল্যাণ তহবিল থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জন্য নির্বাচিত ৮০৯টি যুব সংগঠনকে মোট তিন কোটি ৩০ লাখ টাকার প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এ অর্থ যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমকে আরও বেশি গতিশীল করবে এবং যুববান্ধব সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করবে।

পুষ্টি চাল পাচ্ছে চার লাখের বেশি ভিজিডি উপকারভোগী নারী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দেশের ১৮৯টি উপজেলায় চার লাখ একত্রিশ হাজার নারী ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) উপকারভোগীর মাঝে পুষ্টি চাল বিতরণ করছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পর্যায়ক্রমে দশ লাখ চল্লিশ হাজার নারী ভিজিডি উপকারভোগীদের পুষ্টি চাল প্রদান করা হবে। পরিবারপ্রতি পাঁচজন করে মোট পঁচিশ লাখ মানুষ পুষ্টি চালের সুবিধায় এসেছে। প্রতিটি পরিবার মাসে ৩০ দশমিক ৩০ কেজি পুষ্টি চাল পাচ্ছে। ২৯শে ডিসেম্বর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির যৌথ আয়োজনে দুদিনব্যাপী পুষ্টি চাল বিতরণ বিষয়ে বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পুষ্টি চালের মান নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণে কাজ করছে। পুষ্টি চালের চাহিদা মেটানোর জন্য সাতটি কার্নেল কারখানা ও ১১০টি মিক্সিং মিল স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ২৯শে ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে পুষ্টি চাল বিতরণ বিষয়ে বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ব্রির ধান কাটার নতুন যন্ত্র তৈরি

দেশেই ধান কাটার যন্ত্র তৈরি করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীরা। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রি হোলফিড কম্বাইন হারভেস্টার'। এর দাম পড়বে ১২ থেকে ১৩ লাখ টাকা। ব্রির জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলমের নেতৃত্বে সাত-আটজনের দল গবেষণা করে যন্ত্রটি ছয় মাসের চেষ্টায় তৈরি করেন। আশরাফুল আলম ৩১শে ডিসেম্বর সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, এই যন্ত্রের ধান কাটার ক্ষমতা এই ধরনের বিদেশি যন্ত্রের তুলনায় বেশি। এটি দেশের ছোটো ছোটো জমিতে ব্যবহারের উপযোগী। ফসল কাটার সক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশি। যন্ত্রটি ২০ বছর চলবে বলে আশা করছেন তারা।

গবেষক দলের অন্যতম সদস্য কারুজ্জামান মিলন বলেন, বিদেশ থেকে ধান কাটার যে যন্ত্রগুলো আনা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে 'বিজয়ের ৫০ বছর: কৃষি খাতে অর্জন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

হয়, সেগুলো মূলত বিস্তৃত মাঠের জন্য। বাংলাদেশের জমি টুকরা টুকরা। এ বিষয় মাথায় রেখে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। এছাড়া কৃষিযন্ত্রের আমদানিনির্ভরতা কমাতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়। গাজীপুরে ব্রির চত্বরে কম্বাইন হারভেস্টারটির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক। এ সময় তিনি বলেন, ব্রির বিজ্ঞানীরা নিজেরা গবেষণা করে ধান কাটার যন্ত্রটি তৈরি করেছেন। এটি একটি অসাধারণ সাফল্য।

লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন

দেশে প্রথমবারের মতো লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। এর ফলে লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধান গবেষণায় নতুন দিগন্তের সূচনা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২৩শে ডিসেম্বর ময়মনসিংহে বিনায় এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বলেন, দেশের ২ মিলিয়ন হেক্টর জমি লবণাক্ত, যেখানে বছরে ১টি ফসল হয়। খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে ও ভবিষ্যতে খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সরকার লবণাক্ত, হাওড়সহ প্রতিকূল এলাকায় বছরে ২-৩টি ফসল উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ জিনোম উন্মোচনের ফলে লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের ধান উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ সহজতর হবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, বিনা ও বাকৃবির যৌথ এ গবেষণায় বিভিন্ন মাত্রার গামা রেডিয়েশন প্রয়োগ করে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক মিউট্যান্ট সৃষ্টি করে তা থেকে নানামুখী পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে গ৬ জেনারেশনে ৩টি উন্নত মিউট্যান্ট শনাক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত মিউট্যান্টগুলো প্যারেন্ট অপেক্ষা উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং ৮ ফঝ/স মাত্রার লবণাক্ততা ও ১৫ দিন জলমগ্নতা সহিষ্ণু। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় আকস্মিক বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ধান চাষ ব্যাহত হচ্ছে। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কার্যকরী উপায় হচ্ছে লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের উন্নত জাত উদ্ভাবন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী প্রায় এক দশক ধরে কাজ করে চলেছেন।

প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান উদ্‌বোধন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বাংলাদেশে মাল্টিসেক্টরাল সাসটেইনেবল প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান উদ্‌বোধন করেন। ২০শে ডিসেম্বর ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান চালুর ঘোষণা দেন তিনি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, প্লাস্টিক হুমকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্লাস্টিক দূষণ কমানোর জন্য কয়েকটি উদ্যোগ এবং পরবর্তীতে এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন ২০শে ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'মাল্টিসেক্টরাল সাসটেইনেবল প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান ইন বাংলাদেশ'-এর উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

মন্ত্রী বলেন, কর্মপরিকল্পনায় থ্রি-আর (যেমন হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার) কৌশলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যা সরকার সামগ্রিক সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চায়। দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে আরও বেশি লোককে উৎসাহিত করতে হবে। তিনি প্লাস্টিক পণ্যের বিকল্প ব্যবহার করার জন্য এবং আগে থেকেই ব্যবহার করা জিনিসগুলোকে রিসাইকেল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অপ্রয়োজনীয় হর্ন বাজানো বন্ধ করতে হবে

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, শব্দদূষণ কমাতে গাড়িচালকদের অভ্যাসগতভাবে অপ্রয়োজনীয় হর্ন বাজানো বন্ধ করতে হবে। এলক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশে কেউই অহেতুক হর্ন বাজায় না। আমাদের দেশেও যাতে ড্রাইভাররা অপ্রয়োজনীয় হর্ন বাজানোর অভ্যাস দূর করে তা

নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২৯শে ডিসেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত '২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ওপর নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা' সভায় সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন। পরিবেশ মন্ত্রী আরও বলেন, শব্দদূষণ বন্ধে হাইড্রলিক হর্ন বন্ধ কার্যকরকরণ এবং অন্যান্য সকল ধরনের শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মন্ত্রিসভায় শব্দদূষণসহ সকল প্রকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালকদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম ১লা ডিসেম্বর ২০২১ রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে চীনের সঙ্গে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

বর্জ্য বিদ্যুতে হবে স্মার্ট শহর

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বর্জ্য বিদ্যুৎ স্মার্ট শহর গড়তে তাৎপর্যময় অবদান রাখবে। বর্জ্যের এই ব্যবস্থাপনা শুধু বিদ্যুৎই দেবে না, একইসঙ্গে গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করবে। ১লা ডিসেম্বর সোনারগাঁওয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে ঢাকার আমিনবাজারে '৪২.৫ মেগাওয়াট বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প'-এর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের সকল জেলায় বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। ঢাকা শহরে দ্রুত ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল চালু করতে পারলে পরিবেশের জন্য খুবই ভালো হয়। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের দক্ষতাও বেশি এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী। বিদ্যুৎ বিভাগ প্রয়োজনীয় চার্জিং স্টেশন করে দেবে। এসময় তিনি বিদ্যুতের তার ভূগর্ভস্থ করার বিষয়ে মেয়রদের সহযোগিতা কামনা করেন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এই মেগাওয়াট বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে চায়না মেশিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (সিএমইসি), চায়না। পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে EU 2010/75/EY মানদণ্ড প্রয়োগ করে CMEC কর্তৃক নিজ খরচে Ash yard নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত প্রায় ২০ একর জমি ক্রয়, প্রায় ১২ কিমি. ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও GIS Bay তৈরি করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৪২.৫ মেগাওয়াট বর্জ্য বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন স্পন্সর কোম্পানিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ৩০ একর জমি ও দৈনিক ৩০০০ মে. টন বর্জ্য সরবরাহ করবে। No Electricity, No Payment-এর ভিত্তিতে স্থাপনকৃত এই কেন্দ্রের প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ US $ 0.2178 (বা ১৮.২৯৫ টাকায়) ক্রয় করা হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তির মাধ্যমে দেশে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। ইনসিনারেশন পদ্ধতি অর্থাৎ বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা প্রয়োজন হবে তা সরবরাহ করলে শহরে ময়লার সমস্যা থাকবে না বলেও জানান মন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। কার্যক্রম শুরু হওয়ার ১৮ মাসের মধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাবে চীনা কোম্পানি। এ ব্যাপারে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, চীনা কোম্পানি নিজ ঝুঁকিতে প্ল্যান্ট স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় জমি ও নিয়মিত বর্জ্য সরবরাহ করবে। আর উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় করবে বিদ্যুৎ বিভাগ। বাংলাদেশের জন্য ইনসিনারেশন অর্থাৎ বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি সর্বোত্তম। এই পদ্ধতিতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। তাই প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়ে বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সচিব সাইফুল ইসলাম আজাদ ও সিএমইসি'র উপ-মহাব্যবস্থাপক ওয়াং পেংফেই (Wang Pengfei) এবং বাস্তবায়ন চুক্তিতে বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে যুগ্মসচিব নাজমুল আবেদীন স্বাক্ষর করেন।

প্রতিবেদন : রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

চার লেনে যুক্ত হচ্ছে ঢাকা-ভোমরা

ভোমরা স্থলবন্দরকে চার লেনে যুক্ত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)। পণ্য আমদানি-রপ্তানির অন্যতম করিডোর সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর।

ভোমরা-সাতক্ষীরা-নাভারণ-যশোর-ঝিনাইদহ-বনপাড়া-হাটিকুমরুল অ্যালাইনমেন্টটি ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোরের গুরুত্বপূর্ণ রুট, যার দৈর্ঘ্য হবে ২৬০ কিলোমিটার। ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর অ্যান্ড রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট (উইকেয়ার) প্রোগ্রামের আওতায় এতে বিনিয়োগ করবে বিশ্বব্যাংক। পাশাপাশি এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকও (এআইআইবি) এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে। কয়েকটি ফেজে ভাগ করে ভোমরা

স্থলবন্দর চার লেনে প্রথমে সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুলে যুক্ত হবে। এরপরে হাটিকুমরুল থেকে চার লেনে ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হবে ভোমরা।

প্রকল্প বাস্তবায়নে উইকেয়ার ফেজ-১-এর আওতায় 'কুষ্টিয়া (লালন শাহ্ সেতু)-ঝিনাইদহ মহাসড়কও উন্নয়ন করবে এআইআইবি। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। প্রকল্পের মোট ব্যয় পাঁচ হাজার ৫১৩ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। প্রকল্পে এআইআইবি বিনিয়োগ করবে তিন হাজার ৪৯৩ কোটি ৭২ লাখ টাকা। বাকি দুই হাজার ২০ কোটি ২৫ লাখ টাকা সরকারি তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া হবে। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী আবদুস সবুর ২৮শে ডিসেম্বর সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ভোমরা থেকে হাটিকুমরুল খুবই গুরুত্বপূর্ণ করিডোর। একটি অংশ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

বিমানবন্দর থেকে ২০ মিনিটেই যাত্রাবাড়ী

নগরীর যানজট নিরসনে জাদুরকাঠি হিসেবে কাজ করবে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (উড়াল সড়ক) প্রকল্প। দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে প্রকল্পের কাজ। চার লেনের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মূল লেনের দৈর্ঘ্য ১৯ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার। ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার গতিতে গাড়ি ছুটবে নগরবাসীর স্বপ্নের এ প্রকল্পে। বিমানবন্দর থেকে মাত্র ১৫ থেকে ২০ মিনিটেই পাড়ি দেওয়া যাবে যাত্রাবাড়ী।

প্রকল্প পরিচালক এএইচএমএস আকতার সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, চীনের সিনোহাইড্রো প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার পর কাজে গতি পেয়েছে। এরই মধ্যে সাড়ে ছয় কিলোমিটার উড়াল সড়কের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়েই বাকি কাজ শেষ হবে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ৮০ কিলোমিটার গতিতে যানবাহন চলবে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সূত্র অনুযায়ী, উড়াল সড়ক বাস্তবায়নের পর ঢাকার উত্তর-দক্ষিণে বিকল্প সড়ক সৃষ্টি হবে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি হেমায়েতপুর-কদমতলী-নিমতলী-সিরাজদিখান-মদনগঞ্জ-ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক-মদনপুরে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে। উড়ালসড়ক শুধু বিমানবন্দর ও যাত্রাবাড়ী রুটের যাত্রীদেরই স্বস্তি দেবে না, একইসঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেটসহ পূর্বাঞ্চল এবং পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহন ঢাকায় প্রবেশ না করে সরাসরি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করতে সহায়তা করবে। উত্তরাঞ্চল থেকে আসা যানবাহনগুলো ঢাকাকে বাইপাস করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি যাতায়াত করতে পারবে।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনার টিকার বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু

দেশে করোনা টিকার বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে। ১৯শে ডিসেম্বর মহাখালীতে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনসে (বিসিপিএস) এই টিকাদান কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করা

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক মহাখালীতে বিসিপিএস অডিটোরিয়ামে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ নেন –পিআইডি

হয়। দেশে প্রথম করোনা টিকা গ্রহণকারী কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স রুনু ভেরোনিকা কস্তাকে দিয়েই প্রথম বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়। এই দিন একাধিক মন্ত্রীসহ ৪৪জন বুস্টার ডোজ নিয়েছেন।

আর করোনা টিকার নিয়মিত কেন্দ্রগুলোতে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে ২২শে ডিসেম্বর থেকে। ইতোমধ্যে দুই ডোজ টিকা নিয়েছেন এমন ব্যক্তিরা বুস্টার ডোজ হিসেবে তৃতীয় ডোজ পাবেন। এজন্য নতুন করে নিবন্ধন করার দরকার নেই। দ্বিতীয় ডোজ পাওয়ার ছয়মাস পরই কেবল বুস্টার ডোজ নেওয়া যাবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি, সম্মুখসারির ব্যক্তি হিসেবে চিকিৎসক, নার্স, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, গণমাধ্যম কর্মীদের বুস্টার ডোজের আওতায় আনা হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

করোনার নতুন ওষুধ 'প্যাক্সোভির' নিয়ে এলো এসকেএফ

করোনা চিকিৎসায় আরও একটি নতুন ওষুধ বাজারে নিয়ে এসেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ওষুধ কোম্পানি এসকেএফ। 'প্যাক্সোভির' নামের এই কম্বিনেশন ওষুধটি জরুরি ব্যবহারের জন্য ৩০শে ডিসেম্বর অনুমোদন দিয়েছে সরকারের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। এর আগে 'রেমিভির' ও 'মনুভির' নামে আরও দুটি ওষুধ বাজারে এনেছিল এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

এসকেএফ বলছে, নতুন এই ওষুধ করোনার উপসর্গ তীব্র হতে বাধা দেবে এবং রোগীর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া কমাবে। ওষুধটি প্রায় ৮৯ শতাংশ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে গর্ভবতী নারী ও ১২ বছরের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে ওষুধটি প্রয়োগ করা যাবে না।

ওমিক্রন ঠেকাতে মাস্কে গুরুত্বারোপ

বিশ্বব্যাপী করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে মাস্ক পরার উপর গুরুত্বারোপ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। দ্রুততার সঙ্গে মাস্কের উৎপাদন বৃদ্ধি, মাস্ক কেনা ও মাস্ক বিতরণ করার জন্য সদস্য দেশগুলোর কাছে সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। ২২শে ডিসেম্বর নিজেদের ওয়েবসাইটে এই সুপারিশ করেছে তারা।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

রেলকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে

রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, রেলের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রেলকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। মন্ত্রী ২৮শে ডিসেম্বর রেলভবনে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৫৮০টি মিটারগেজ ওয়াগন কেনার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে একথা বলেন।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, সারা দেশের রেল যোগাযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন বন্দরের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতের সঙ্গে ৮টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টের মধ্যে বর্তমানে পাঁচটি চালু করা হয়েছে, আরও তিনটি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুলনার সাথে মোংলা পোর্টে যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। আগামী বছর ডিসেম্বরে কক্সবাজার রেললাইন চালুর লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলছে। পর্যায়ক্রমে সকল মিটারগেজকে ব্রডগেজ-এ রূপান্তর করা হবে।

ঢাকায় রেলভবনে রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজনের উপস্থিতিতে ২৮শে ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৫৮০টি মিটারগেজ ওয়াগন ক্রয়ে বাংলাদেশের পক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক মো. মিজানুর রহমান এবং চীনের সিআরআরসি কোম্পানি লিমিটেডের ভাইস প্রেসেডেন্ট Dai Xien স্বাক্ষর করেন –পিআইডি

যমুনা নদীর উপর আলাদা সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ৩১৮ কোটি ৬৩ লাখ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫৮০টি মিটারগেজ ওয়াগন সংগ্রহের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৫ কিমি. গতিতে উত্তরা-আগারগাঁও রুটে চলল মেট্রোরেল

পারফরম্যান্স টেস্টের অংশ হিসেবে সর্বোচ্চ ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার গতিতে উত্তরা থেকে আগারগাঁও রুটে চলাচল করেছে মেট্রোরেল। উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের দূরত্ব ১১ দশমিক ৫৮ কিলোমিটার। ৯ই ডিসেম্বর এই পথ পাড়ি দিতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা। চলার সময় উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া ও শেওড়াপাড়া স্টেশনে থেমে দুপুর ১২টা ৪৭ মিনিটে আগারগাঁও অংশে পৌঁছে যায় রেল। ১২ই ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক মেট্রোরেল উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চলবে। এজন্য ৯ই ডিসেম্বর এ অংশে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রোরেল চালানো হয়েছে। এর আগে মিরপুর-১০ নম্বর পর্যন্ত মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল সীমাবদ্ধ ছিল। পরীক্ষামূলক বলে এ চলাচলে যাত্রী পরিবহণ করা হবে না।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও শ্রমবাজার খোঁজার আহ্বান

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের মিশনগুলোর দায়িত্ব হবে নতুন শ্রমবাজার খুঁজে শ্রমশক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ফলে একদিকে সেদেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরাসরি ভূমিকা রাখবে অন্যদিকে শ্রমিকরা রেমিটেন্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। আমাদের প্রবাসী শ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশই মধ্যপ্রাচ্যে। আমরা অন্যান্য অঞ্চলেও শ্রমশক্তি প্রেরণ করতে চাই। সেক্ষেত্রে তাদেরকে আরও দক্ষ করে পাঠাতে পারলে সুফল পাওয়া যাবে। ৬ই জানুয়ারি বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি ও পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি বাস্তবায়নে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন। সম্প্রতি রোমানিয়ায় লোক প্রেরণের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, অন্যান্য দেশেও আমাদের শ্রমশক্তি প্রেরণের লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে। তিনি আফ্রিকা অঞ্চলে কনট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সেখানে প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সেসব দেশের সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ বৃদ্ধির তাগিদ দেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে বিদেশে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কূটনৈতিক তৎপরতা

চালাতে বাংলাদেশ মিশনসমূহের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে। দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৬ই জানুয়ারি বরিশাল জেলার আগৈলঝড়া উপজেলায় প্রবাসী কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের রূপকল্প–২০২১ ও নির্বাচনি ইশতাহারসহ আন্তর্জাতিক দলিলে শ্রম অভিবাসনকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সংস্কৃতির রঙে রঙিন বিজয় দিবস

এবারের ১৬ই ডিসেম্বর ছিল আমাদের ৫০তম বিজয় দিবস। দিবসটি উদ্‌যাপনে গোটা জাতি ভেসেছিল বাঁধভাঙা আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উল্লাস আর মুক্তির উন্মাদনায়। লাল-সবুজের পোশাকে নিজেদের আবৃত করে স্বদেশের প্রতি প্রকাশ করেছে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

ফুলেল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাশাপাশি নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক ও চলচ্চিত্রসহ নানা আয়োজনে জাতির সূর্যসন্তানদের প্রতি হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসার উচ্ছ্বাস চিত্রিত হয়েছে রাজধানীসহ সারা দেশে। বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর এই আয়োজনে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এবারের বিজয় দিবস জাতির কাছে সঙ্গত কারণেই ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বয়সের ভেদাভেদ ভুলে আবালবৃদ্ধবনিতা মেতেছিল আনন্দ আর উল্লাসে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, গান, আবৃত্তি আর নাচের মুদ্রায় বিজয়ের উল্লাসে গোটা রাজধানীজুড়ে মূর্ত হয়ে উঠে মুক্তির উল্লাস, উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনা।

শিল্পকলা একাডেমির আয়োজন

জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন, বাউল সংগীত পরিবেশন, স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ নানা আয়োজনে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করেছে শিল্পকলা একাডেমি। সকালে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর দুপুর ২টা পর্যন্ত স্মৃতিসৌধে দেশাত্মবোধক গান ও বাউল সংগীত পরিবেশন করে শিল্পীরা। এ দিন বিকালে একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় সংসদ ভবনের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পরিচালিত শপথ গ্রহণ করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সব দপ্তর-সংস্থার কর্মচারীরা।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

মুক্তি পেল *চিরঞ্জীব মুজিব*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* অবলম্বনে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *চিরঞ্জীব মুজিব* মুক্তি পেল ৩১শে ডিসেম্বর। সারা দেশের মধ্যে প্রথমে ছবিটি মুক্তি পেল বগুড়ার মধুবন সিনেপ্লেক্সে। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল, অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত

হয়েছে ছবিটি। পর্যায়ক্রমে দেশ-বিদেশের অন্যান্য সিনেমা হলেও চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হবে। *চিরঞ্জীব মুজিব* চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আহমেদ রুবেল। বেগম ফজিলাতুন নেছা রেণুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা এবং বঙ্গবন্ধুর মা ও বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে খায়রুল আলম সবুজ ও দিলারা জামান। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন এস এম মহসীন, নরেশ ভুঁইয়া, শতাব্দী ওয়াদুদ, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, আরমান পারভেজ মুরাদ, কায়েস চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, সমু চৌধুরীসহ পাঁচ শতাধিক শিল্পী। *চিরঞ্জীব মুজিব* প্রযোজনা করেছেন লিটন হায়দার। সংগীত পরিচালনা করেছেন ইমন সাহা। চলচ্চিত্রটির গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন, কুমার বিশ্বজিৎ, কোনাল, নোলক বাবু, কিরণ চন্দ্র রায়। চলচ্চিত্রটিতে

গগন হরকরা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্‌দীনের গান ব্যবহার করা হয়েছে।

কান পুরস্কার জিতল *টেনর*

ফ্রান্সের কান ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কার জিতেছে দেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা *টেনর*। সিনেমার পরিচালক রাহি আবদুল্লাহ অর্জন করেছেন *বেস্ট ইয়াং ফিল্ম মেকার*-এর স্বীকৃতি। প্রত্যেক মাসেই সারা বিশ্ব থেকে অসংখ্য ফিল্ম কানের এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জমা পড়ে। সেখান থেকে নভেম্বর মাসে রাহি আবদুল্লাহর *টেনর* ছাড়াও আরও একটি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছে। সম্প্রতি কান ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ তাদের অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নভেম্বর মাসে নির্বাচিত সেরা চলচ্চিত্রগুলোর নাম প্রকাশ করেছে। এর আগেও *টেনর* দেশ ও বিদেশের বেশ কয়েকটি ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল চিল্ড্রেন'স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এর ১৪তম আসরে বেস্ট ফিল্ম আন্ডার ১৮ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পায় *টেনর*। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার চাঙ্গিয়ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জুরি অ্যাওয়ার্ড, গিমপো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, জিকসা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, বিইউপি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, সিনেমেকিং ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্য সাবিরা কোল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ও কলকাতার হট্টমেলা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মনোনীত হয় *টেনর*।

মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা *লাল মোরগের ঝুঁটি*

মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা *লাল মোরগের ঝুঁটি* মুক্তি পেল ১০ই ডিসেম্বর। মুক্তিযুদ্ধের গল্প একইসঙ্গে বাঙালির আনন্দ ও বেদনার গল্প। পাণ্ডুলিপি কারখানার ব্যানারে নির্মিত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন লায়লা হাসান, আহমেদ রুবেল, অশোক ব্যাপারী, আশীষ খন্দকার, ইলোরা গহর, জ্যোতিকা জ্যোতি, আশনা হাবিব ভাবনা, দিলরুবা দোয়েলসহ অন্যান্য শিল্পীরা। মূলত মহান মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপট উঠিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে এই সিনেমার মধ্য দিয়ে। পাণ্ডুলিপি কারখানা প্রযোজিত ছবিটি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পায়।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর সংগ্রামের সিনেমা *কালবেলা*

কালবেলা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে একজন নারীর সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে নির্মিত। পাশাপাশি চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছে যুদ্ধকালীন সাধারণ মানুষের আশ্রয়ের সন্ধানে অনিশ্চিত যাত্রা, পাকিস্তানি বাহিনী ও তার দোসরদের নির্মমতা এবং যুদ্ধকালীন সামাজিক অস্থিরতা। মুক্তিযোদ্ধা, বরেণ্য চলচ্চিত্রকার এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইদুল আনাম টুটুলের সর্বশেষ নির্মাণ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *কালবেলা*। চলচ্চিত্রটি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং প্রযোজনা সংস্থা 'আকার'-এর ব্যানারে নির্মিত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং প্রযোজনা সংস্থার আয়োজনে আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় *কালবেলা* চলচ্চিত্রটির উদ্‌বোধনী প্রদর্শনী। চলচ্চিত্রটি ১০ই ডিসেম্বর ঢাকার স্টার সিনেপ্লেক্স ও ব্লকবাস্টার সিনেমা এবং চট্টগ্রামের সিলভার স্ক্রিন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।

প্রতিবেদন : মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

সরকারি চাকরির জন্য নিয়োগের আগে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদেরও ডোপ টেস্টের আওতায় আনা হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। ২৮শে ডিসেম্বর সচিবালয়ে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, সরকারি যে-কোনো চাকরির জন্য ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী অনুশাসন দিয়ে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি। কাজেই এখন থেকে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও চাচ্ছি, যাতে নতুন প্রজন্ম বিপথগামী না হয়, ভুল পথে না যায়, সেজন্য ধীরে ধীরে ব্যবস্থা নিচ্ছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, নিরাপত্তা বাহিনীতে যারা চাকরি করছেন এবং মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করছেন, তাদের মধ্যে যাদের মাদকাসক্ত বা মাদকের সঙ্গে জড়িত বলে মনে হচ্ছে এবং ডোপ টেস্টে যারা শনাক্ত হয়েছেন, তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন সব নিয়োগে ইতোমধ্যে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

বিজিবি'র অভিযানে বিপুল পরিমাণ চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) নভেম্বর ২০২১ মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮৭ কোটি ৯৬ লাখ ৮৬ হাজার টাকা মূল্যমানের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান পণ্যসামগ্রী, অস্ত্র ও গোলাবারুদ মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে। ৩রা ডিসেম্বর বিজিবি তাদের এই নথি প্রকাশ করে। জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ১৩ লাখ ১২ হাজার ২৬৯ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩ কেজি ২৩০ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস, ২৪ হাজার ৫৫০ বোতল ফেনসিডিল, ১৬ হাজার ২২৪ বোতল বিদেশি মদ, ১ হাজার ৪৩৬ ক্যান বিয়ার, ১ হাজার ৩৫৮ কেজি গাঁজা, ৮ কেজি ৩৪০ গ্রাম হেরোইন, ৯ হাজার ৯০২টি ইনজেকশন, ৫ হাজার ৬৯৮টি ইস্কাফ সিরাপ, ১ হাজার ৮৮৯ বোতল এমকেডিল/কফিডিল, ৩৪ হাজার ২১৫টি বিভিন্ন প্রকার ঔষধ, ৩৯ হাজার ৫৫৯টি এনেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট এবং ১০ লাখ ৪৭ হাজার ৭৭৩টি অন্যান্য ট্যাবলেট।

প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির দুই যুগ পূর্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই আওয়ামী লীগ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির মাধ্যমে

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। ইউনেসকো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্মারক। ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য জেলাসমূহের জনগণ ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান এবং পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, পার্বত্য জেলাগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে পার্বত্য জেলাসমূহে দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান ঘটে। সূচিত হয় শান্তির পথচলা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ উদ্যোগ শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির পিতার সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

পার্বত্য এলাকায় দৃশ্যমান উন্নয়ন হচ্ছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য এলাকার মানুষের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক। এ সরকারের সময়ে পার্বত্য এলাকায় দৃশ্যমান টেকসই উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, যোগাযোগ অবকাঠামো ও নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের ফলে মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ১৭ই ডিসেম্বর বান্দরবান সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার দেশের অন্যান্য এলাকার মতো রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে স্কুল-কলেজ, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধবিহার, সড়ক যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন করে জনগণের ভাগ্যের চাকা সচল করেছে। তিনি এসময় আগামীতেও এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদন : আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ৫০ হাজার টাকা শিক্ষা সহায়তা পেল মেধাবী স্মৃতি

জন্মগত দুই পা-হারা মেধাবী শিক্ষার্থী আবেদা অঞ্জুম স্মৃতি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ৫০ হাজার টাকা সহায়তা পেয়েছে। ৫ই ডিসেম্বর স্মৃতি এই টাকা উত্তোলন করে। দুই পাহীন জন্ম নেওয়া স্মৃতি দেড় বছর বয়সে বাবাকে হারায়। মায়ের কোলে চড়ে পিইসি, জেএসসি ও দাখিল পরীক্ষা দিয়ে পাস করে সে। এ বছর স্মৃতি ভবানীপুর ফাজিল সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষা দিয়েছে। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া স্মৃতি দুই হাতে ভর করে মাটিতে ছেঁচড়ে চলাফেরা করে।

বাল্যবিবাহ ঠেকাতে কিশোরী নিজেই থানায় হাজির

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় এক মাদ্রাসা ছাত্রী নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকাতে ১৩ই ডিসেম্বর রাতে থানায় গিয়ে পুলিশের সহায়তা চায়। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তার বিয়ের আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধী নুশরাত জাহান মিম উপজেলার মরুখারী আহদাবাদ নূর আলা নূর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। সে ওই গ্রামের অটোরিকশাচালক আব্দুর রহমানের মেয়ে। সম্প্রতি তার মা জর্ডান থেকে দেশে ফিরে এই বিয়ের আয়োজন করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মা-বাবা ওই ছাত্রীকে না জানিয়ে বিয়ে ঠিক করেন। ১৩ই ডিসেম্বর পাশের ভান্ডারিয়া উপজেলার হরিণপালা গ্রাম থেকে ছেলেপক্ষ দেখতে এসে মেয়েটিকে আংটি পরায়। মেয়েটি মা-বাবাকে না জানিয়ে ওই রাতেই থানায় গিয়ে অভিযোগ করে। পুলিশ বিষয়টি উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে জানায়। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের পরিচর্যা করলে তারা সম্পদে পরিণত হবে

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের বোঝা নয়। তাদেরকে যথাযথভাবে পরিচর্যা করলে তারা সম্পদে পরিণত হবে। মন্ত্রী ৩রা ডিসেম্বর ৩০তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৩তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফরমে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান ৬ই ডিসেম্বর ২০২১ জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করেন –পিআইডি

জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে যেসকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন সেগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সম্পদে পরিণত হয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব দেশ বিনির্মাণে সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থাসহ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী সকলকে মন্ত্রী আহ্বান জানান। রাজধানী ঢাকার মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ থেকে পরিচালিত আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহফুজা আখতার।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল ৯ই ডিসেম্বর ২০২১ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আয়োজিত 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)' প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন –পিআইডি

হুইলচেয়ারে বসে সংবাদ পাঠ করলেন আজিজ

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হুইলচেয়ারে বসে সংবাদ পাঠ করলেন শারীরিক প্রতিবন্ধী হেদায়তুল আজিজ মুন্না। বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসএটিভির মূল ভবনে নিউজ আপডেট পড়েন তিনি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলস্রোতে যুক্ত করতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো টেলিভিশন পর্দায় সংবাদ পাঠ করতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শারীরিক প্রতিবন্ধী হেদায়তুল আজিজ মুন্না বলেন, এসএটিভি পরিবারকে স্যালুট জানাই। তারা এ ধরনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সম্পৃক্ত করে এসএটিভি আরও ভালো ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করবে এটা আমি আশা করি। শুধু কথায় সীমাবদ্ধ না থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলস্রোতে যুক্ত করতেই এসএটিভির পর্দায় এই সাহসী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ড। সেই নিউজিল্যান্ডকে তাদেরই মাটিতে হারিয়ে টেস্টে ঐতিহাসিক এক জয় পেল বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে যে-কোনো ফরম্যাটেই এটি বাংলাদেশের প্রথম জয়। ৫ই জানুয়ারি মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে প্রথম টেস্টের শেষ দিনে ৮ উইকেটের বড়ো জয় পায় বাংলাদেশ। কিউইদের দেওয়া ৪০ রানের টার্গেটে ২ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। ৫ উইকেটে ১৪৭ রান নিয়ে শেষ দিনের খেলা শুরু করে নিউজিল্যান্ড। তবে এবাদত-তাসকিনদের তোপে বেশি দূর এগোতে পারেনি নিউজিল্যান্ড, দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৯ রানে গুটিয়ে যায়। প্রথম ইনিংসে ১৩০ লিড নেওয়া বাংলাদেশের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪০ রানের। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বেগ পেতে হয়নি টাইগারদের। ১৬.২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে পাঁচে বাংলাদেশ

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবার ম্যাচ জিতে নামের পাশে মূল্যবান ১২ পয়েন্ট যোগ করেছে বাংলাদেশ। এতে করে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। তাদের ওপরে আছে কেবল অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান আর ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড এখন বাংলাদেশের নিচে। পাঁচ নম্বরে থাকা বাংলাদেশ ১২ পয়েন্ট পেয়েছে ৩৩.৩৩ শতাংশ ম্যাচ জিতে।

ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের শিরোপা জয়

সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলের ফাইনালে দুরন্ত জয় দিয়ে শিরোপা ঘরে তুলেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। ২২শে ডিসেম্বর দারুণ লড়াইয়ে শক্তিশালী ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে মারিয়া মান্ডারা। ম্যাচজুড়ে ভারতকে চাপের মুখে রেখে শেষ মুহূর্তে আনাই মগিনির গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। আর এ গোলেই চ্যাম্পিয়নের তকমা পায় গোলাম রব্বানি ছোটনের দল। এদিন কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে খেলার ৮০ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র জয়সূচক গোল করেছেন আনাই মগিনি।

প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের চিরপ্রস্থান

আফরোজা রুমা

একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৩০শে নভেম্বর ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

রফিকুল ইসলাম ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারি চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার কলাকান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেখাপড়া করেন। ভাষাতত্ত্বে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেন ও গবেষণা সম্পাদনা করেন আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, মিশিগান-অ্যান আরবর বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টারে। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম নজরুল অধ্যাপক এবং নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়া রফিকুল ইসলাম সেই সময়ের দুর্লভ আলোকচিত্র ধারণ করেছেন নিজের ক্যামেরায়। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে হয়েছেন নির্যাতিত। বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের এই প্রত্যক্ষ সাক্ষী সেইসব ইতিহাস গ্রন্থিত করে গেছেন তাঁর লেখায়।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে প্রথম গ্রন্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থটিসহ প্রায় ৩০টি বই তাঁর হাত দিয়েই পেয়েছে বাংলাদেশ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো– *নজরুল নির্দেশিকা, ভাষাতত্ত্ব, An Introduction to Colloquial Bengali, নজরুল জীবনী, বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকার কথা, ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য, কাজী নজরুল ইসলামের গীতি সাহিত্য, আবদুল কাদির, ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী, আবুল মনসুর আহমেদ রচনাবলী, বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা, নজরুল প্রসঙ্গে, অমর একুশে ও শহীদ মিনার, বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃষ্টি, কিশোর কবি নজরুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর ও হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য।*

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য রফিকুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসেরও উপাচার্য ছিলেন। ২০১৮ সালের ১৯শে জুন সরকার তাঁকে 'জাতীয় অধ্যাপক' হিসেবে পুরস্কৃত করেন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করা রফিকুল ইসলামকে ২০২১ সালের ১৮ই মে বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিল সরকার। আমৃত্যু তিনি সেই দায়িত্বে ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি। রফিকুল ইসলাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

সাহিত্য চর্চা ও গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও অসাধারণ অবদানের জন্য ২০১২ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রদান করা হয় তাঁকে। এছাড়া তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, নজরুল একাডেমি পুরস্কার এবং মাতৃভাষা সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, বিকাশ, চর্চা, প্রচার-প্রসারে অবদান রাখায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক' লাভ করেন।

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পর্যন্ত বাংলাদেশের বন্ধুর পথ পরিক্রমার অগ্নিসাক্ষী জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৩০শে নভেম্বর ১০ নম্বর সেক্টরের খালিদ বিন ওয়ালিদ মসজিদে এশার নামাজের পর জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের। রাতে মরদেহ রাখা হয় হাসপাতালের হিমঘরে। সবার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ১লা ডিসেম্বর অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের কফিন নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে। আসরের পর আবার জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

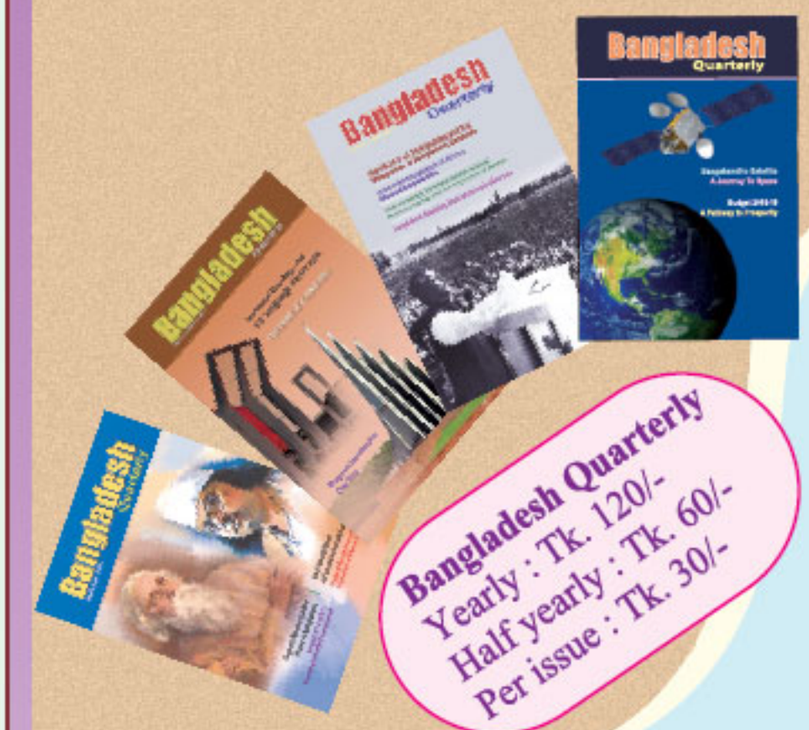

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

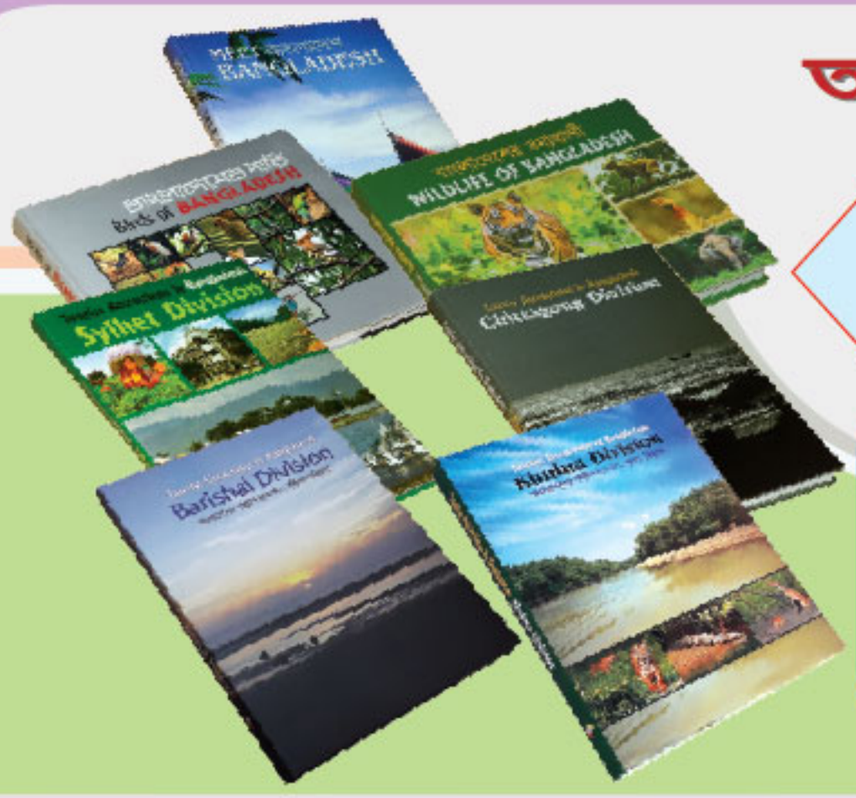

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 08, January 2022, Tk. 25.00

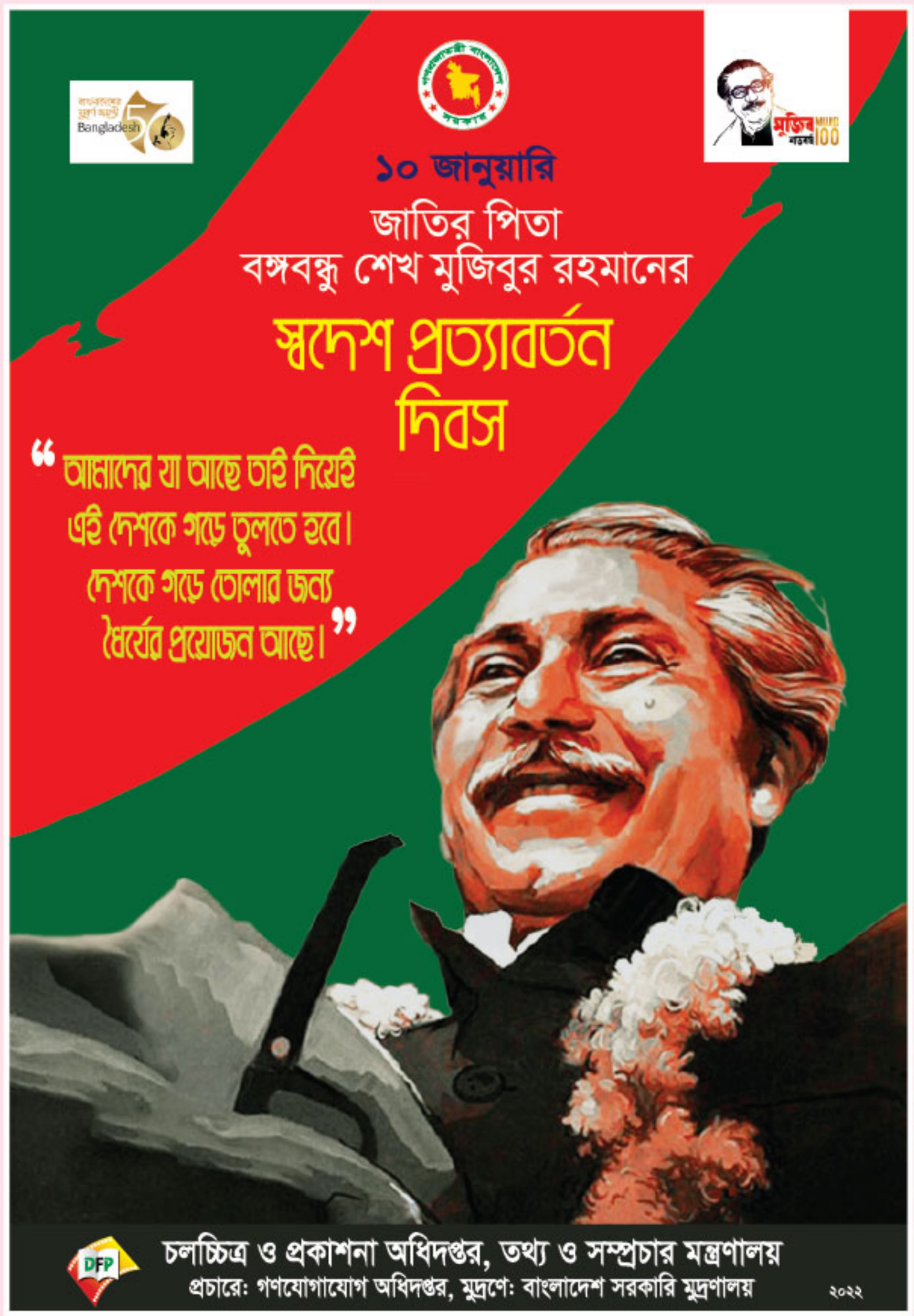

DFP
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd